# মদীয় আচার্য্যদেব।

স্বামী বিবেকানন্দ।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বৈশাখ, ১৩২০।



[ মূল্য ।৵ ছয় আনা।

কলিকাতা।
১২, ১৩ নং গোপালচন্দ্র নিয়োগীর লেন,
উদ্বোধন কার্য্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী কপিল
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।
৬৪।১ ও ৬৪।২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট,
"লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" হইতে
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



স্বামী বিবেকানন্দ।



শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস

# মদীয় আচার্য্যদেব।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন,—

'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥'

হে অর্জ্জুন, যখনই যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রসার হয়, তখনই তখনই আমি (মানবজাতির কল্যাণের জন্য) জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি।

যখনই আমাদের এই জগতে ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ও নূতন নূতন অবস্থাচক্রের দরুণ নব নব সামাজিক শক্তি-সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখনই এক শক্তিতরঙ্গ আসিয়া থাকে, আর মানব আধ্যাত্মিক ও জড় উভয় রাজ্যে বিচরণ করিয়া থাকে বলিয়া উভয় রাজ্যেই এই সমন্বয়-তরঙ্গ আসিয়া থাকে। একদিকে আধুনিক কালে ইউরোপই প্রধানতঃ জড়রাজ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন—আর সমগ্র জগতের ইতিহাসে এশিয়াই আধ্যাত্মিক রাজ্যে সমন্বয়-সাধনের ভিত্তিস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজকাল

মদীয় আচার্য্যদেব।

আবার—আধ্যাত্মিক রাজ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান কালে দেখিতেছি, জড়ভাবসমূহই অত্যুচ্চ গৌরব ও শক্তির অধিকারী; বর্ত্তমান কালে দেখিতেছি, লোকে ক্রমাগত জড়ের উপর নির্ভর করিতে করিতে তাহার ব্রহ্মভাব ভুলিয়া গিয়া অর্থোপার্জ্জক যন্ত্র-বিশেষ হইয়া যাইতে বসিয়াছে—এখন আর একবার সমন্বয়ের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। আর সেই শক্তি আসিতেছে—সেই বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, যাহা এই ক্রম-বর্দ্ধমান জড়বাদরূপ মেঘকে অপসারিত করিয়া দিবে। সেই শক্তির খেলা আরম্ভ হইয়াছে, যাহা অনতিবিলম্বেই মানব-জাতিকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপের কথা স্মরণ করাইয়া দিবে আর এশিয়া হইতেই এই শক্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইতে আরম্ভ হইবে। সমুদয় জগৎ শ্রমবিভাগের প্রণালীতে বিভক্ত। একজনই যে সমুদয়ের অধিকারী হইবে, একথা বলা বৃথা। এইরূপ কোন জাতিবিশেষই যে সমগ্র বিষয়ের অধিকারী হইবে, এরূপ ভাবা আরও ভুল। কিন্তু তথাপি আমরা কি ছেলেমানুষ! শিশু অজ্ঞানবশতঃ ভাবিয়া থাকে যে, সমগ্র জগতে তাহার পুতুলের মত লোভের জিনিষ আর কিছুই নাই। এইরূপই যে জাতি জড়শক্তিতে বড়, সে ভাবে—উহাই একমাত্র

প্রার্থনীয় বস্তু—উন্নতি বা সভ্যতার অর্থ উহা ছাড়া আর কিছু নহে; আর যদি এমন জাতি থাকে, যাহাদের ঐ শক্তি নাই বা যাহারা ঐ শক্তি চাহে না, তাহারা কিছুই নহে, তাহারা জীবন ধারণের অনুপযুক্ত, তাহাদের সমগ্র জীবনটাই নিরর্থক। অন্য দিকে প্রাচ্যদেশীয়েরা ভাবিতে পারে যে, কেবল জড় সভ্যতা সম্পূর্ণ নিরর্থক। প্রাচ্য দেশ হইতে সেই বাণী উঠিয়া এক সময়ে সমগ্র জগৎকে বলিয়াছিল যে, যদি কোন ব্যক্তির দুনিয়ার সব জিনিষ থাকে, অথচ যদি তাহার ধর্ম্ম না থাকে, তবে তাহাতে কি ফল? ইহাই প্রাচ্য ভাব—অপর ভাবটী পাশ্চাত্য।

এই উভয় ভাবেরই মহত্ত্ব আছে, উভয় ভাবেরই গৌরব আছে। বর্ত্তমান সমন্বয় এই উভয় আদর্শের সামঞ্জস্য, উভয়ের মিশ্রণস্বরূপ হইবে। পাশ্চাত্য জাতির নিকট ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ যেমন সত্য, প্রাচ্য জাতির নিকট আধ্যাত্মিক জগৎ তদ্রূপ সত্য। প্রাচ্য জাতি যাহা কিছু চায় বা আশা করে, তাহার নিকট যাহা থাকিলে জীবনটাকে সত্য বলিয়া মনে করে, আধ্যাত্মিক রাজ্যে তাহার সমুদয়ই পাইয়া থাকে। পাশ্চাত্য জাতির চক্ষে সে স্বপ্নমুগ্ধ—প্রাচ্য জাতির নিকট পাশ্চাত্যও তদ্রূপ স্বপ্নমুগ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—সে পাঁচ মিনিটও যাহা স্থায়ী নহে,

মদীয় আচার্য্যদেব।

এমন পুতুলের সহিত খেলা করিতেছে আর বয়স্ক নরনারী-গণ, যে ক্ষুদ্র জড়রাশিকে শীঘ্র বা বিলম্বে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, তাহাকে যে এত বড় মনে করিয়া থাকে, ও তাহা লইয়া যে এত বেশী নাড়াচাড়া করে, তাহাতে তাহার হাস্যরসের উদ্রেক হয়। পরস্পর পরস্পরকে স্বপ্নমুগ্ধ বলিয়া থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্য আদর্শ যেমন মানবজাতির উন্নতির পক্ষে অত্যাবশ্যক, প্রাচ্য আদর্শও তদ্রূপ, আর আমার বোধ হয়—উহা পাশ্চাত্য আদর্শ অপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়। যন্ত্র কখন মানবকে সুখী করে নাই, কখন করিবেও না। যে আমাদিগকে ইহা বিশ্বাস করাইতে চায়—সে বলিবে, যন্ত্রে সুখ আছে—কিন্তু তাহা নহে,—চিরকালই উহা মনেই বর্ত্তমান। যে ব্যক্তি তাহার মনের উপর প্রভুত্ববিস্তার করিতে পারে, কেবল সেই সুখী হইতে পারে, অপরে নহে। আর এই যন্ত্রের শক্তি জিনিষটাই বা কি? যে ব্যক্তি তারের মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতে পারে, তাহাকে খুব বড় লোক, খুব বুদ্ধিমান্ লোক বলিবার কারণ কি? প্রকৃতি কি প্রতি মুহূর্ত্তে উহা অপেক্ষা লক্ষগুণ অধিক তড়িৎপ্রবাহ প্রেরণ করিতেছে না? তবে প্রকৃতির পদতলে পড়িয়া তাহার উপাসনা কর না কেন? যদি

সমগ্র জগতের উপর তোমার শক্তি বিস্তৃত হয়, যদি তুমি জগতের প্রত্যেক পরমাণুকে বশীভূত করিতে পার, তাহা হইলেই বা কি হইবে? তাহাতে তুমি সুখী হইবে না, যদি না তোমার নিজের ভিতর সুখী হইবার শক্তি থাকে, আর যত দিন না তুমি আপনাকে জয় করিতেছ। ইহা সত্য যে, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিবার জন্যই জন্মিয়াছে; কিন্তু পাশ্চাত্য জাতি 'প্রকৃতি' শব্দে কেবল জড় বা বাহ্য প্রকৃতিই বুঝিয়া থাকে। ইহা সত্য যে, নদী-শৈলমালা-সাগর-সমন্বিতা অসংখ্য শক্তি ও নানা ভাবময়ী বাহ্য প্রকৃতি অতি মহৎ। কিন্তু উহা হইতেও মহত্তর মানবের অন্তঃ-প্রকৃতি রহিয়াছে—উহা সূর্য্যচন্দ্রতারকারাজি হইতে, আমাদের এই পৃথিবী হইতে, সমগ্র জড়জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর—আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবন হইতে অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ আর উহা আমাদের গবেষণার অন্যতম ক্ষেত্র। পাশ্চাত্য জাতি যেমন বহির্জ্জগতের গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিয়াছে, এই অন্তস্তত্ত্বের গবেষণায় তদ্রূপ প্রাচ্য জাতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছে। অতএব যখনই আধ্যাত্মিক সামঞ্জস্যের প্রয়োজন হয়, তখনই উহা যে প্রাচ্য হইতে হইয়া থাকে, ইহা ন্যায্যই। আবার যখন প্রাচ্যজাতি যন্ত্রনির্ম্মাণ শিক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তখন তাহাকে যে

মদীয় আচার্য্যদেব।

পাশ্চাত্য জাতির পদতলে বসিয়া উহা শিখিতে হইবে, ইহাও ন্যায্য। পাশ্চাত্যজাতির যখন আত্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ডরহস্য শিখিবার প্রয়োজন হইবে, তাহাকেও প্রাচ্যের পদতলে বসিয়া শিক্ষা করিতে হইবে।

(আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির জীবনকথা বলিতে যাইতেছি, যিনি ভারতে এইরূপ এক তরঙ্গ প্রবাহিত করিয়াছেন।) কিন্তু তাঁহার জীবনচরিত বলিবার অগ্রে তোমাদের নিকট ভারতের ভিতরের রহস্য, ভারত বলিতে কি বুঝায়, তাহা বলিব। যাহাদের চক্ষু জড়বস্তুর আপাতচাকচিক্যে অন্ধীভূত হইয়াছে, যাহারা সারা জীবনটাকে ভোজনপানসম্ভোগরূপ দেবতার নিকট বলি দিয়াছে, যাহারা কাঞ্চন ও ভূমিখণ্ডকেই অধিকারের চূড়ান্ত সীমা বলিয়া স্থির করিয়াছে, যাহারা ইন্দ্রিয়-সুখকেই উচ্চতম সুখ বুঝিয়াছে, অর্থকেই যাহারা ঈশ্বরের আসন দিয়াছে, যাহাদের চরম লক্ষ্য—ইহলোকে কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য সুখ-স্বচ্ছন্দ ও তার পর মৃত্যু, যাহাদের মন দূরদর্শনে সম্পূর্ণ অক্ষম, যাহারা—যে সকল ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ের মধ্যে বাস করিতেছে—তদপেক্ষা উচ্চতর বিষয়ের কথন চিন্তা করে না, এইরূপ ব্যক্তিগণ যদি ভারতে যায়, তাহারা কি দেখে?—তাহারা দেখে—চারিদিকে কেবল দারিদ্র্য,

আবর্জ্জনা, কুসংস্কার, অন্ধকার—বীভৎস ভাবে তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। ইহার কারণ কি? কারণ,—তাহারা সভ্যতা বলিতে পোষাক, পরিচ্ছদ, শিক্ষা ও সামাজিক শিষ্টাচার মাত্র বুঝে। পাশ্চাত্যজাতি তাহাদের বাহ্য অবস্থার উন্নতি করিতে সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছে, ভারত কিন্তু অন্য পথে গিয়াছে। সমগ্র জগতের মধ্যে কেবল তথায়ই এমন জাতির বাস—মানবজাতির সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে যাহাদের নিজদেশের সীমা ছাড়াইয়া অপর জাতিকে জয় করিতে যাইবার প্রসঙ্গ উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহারা কখন অপরের দ্রব্যে লোভ করে নাই, যাহাদের একমাত্র দোষ এই যে, তাহাদের দেশের ভূমি (এবং মস্তিষ্কও) অতি উর্ব্বরা আর তাহারা গুরুতর পরিশ্রমে ধনসঞ্চয় করিয়া যেন অপরাপর জাতিকে ডাকিয়া তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করিতে প্রলোভিত করিয়াছে। তাহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে—তাহাদিগকে অপর জাতি বর্ব্বর বলিতেছে—ইহাতে তাহাদের দুঃখ নাই—ইহাতে তাহাদের পরম সন্তোষ—আর ইহার পরিবর্ত্তে তাহারা এই জগতের নিকট সেই পরম পুরুষের দর্শন-বার্ত্তা প্রচার করিতে চায়, জগতের নিকট মানবপ্রকৃতির গুহ্য রহস্য উদ্ঘাটন করিতে চায়, যে আবরণে মানবের

মদীয় আচার্য্যদেব।

প্রকৃত স্বরূপ আবৃত, তাহাকে ছিন্ন করিতে চায়; কারণ, তাহারা জানে—এ সমুদয় স্বপ্ন—তাহারা জানে যে, এই জড়ের পশ্চাতে মানবের প্রকৃত ব্রহ্মভাব বিরাজমান—যাহা কোন পাপে মলিন হয় না, কাম যাহাকে কলঙ্কিত করিতে পারে না, অগ্নি যাহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল ভিজাইতে পারে না, উত্তাপ শুষ্ক করিতে পারে না, মৃত্যু বিনাশ করিতে পারে না। আর পাশ্চাত্যজাতির চক্ষে কোন জড়বস্তু যতদূর সত্য, তাহাদের নিকট মানবের এই যথার্থ স্বরূপও তদ্রূপ সত্য। যেমন তোমরা "হুর্‌রে হুর্‌রে" করিয়া কামানের মুখে লাফাইয়া পড়িতে সাহস দেখাইতে পার, যেমন তোমরা স্বদেশহিতৈষিতার নামে দাঁড়াইয়া দেশের জন্য প্রাণ দিতে সাহসিকতা দেখাইতে পার, তাহারাও তদ্রূপ ঈশ্বরের নামে সাহসিকতা দেখাইতে পারে। তথায়ই, যখন মানব জগৎকে মনের কল্পনা বা স্বপ্নমাত্র বলিয়া ঘোষণা করে, তখন সে যাহা বিশ্বাস করিতেছে, সে যাহা চিন্তা করিতেছে, তাহা যে সত্য—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য পোষাক পরিচ্ছদ বিষয় সম্পত্তি সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া থাকে। তথায়ই মানব—জীবনটা দুদিনের নয়, প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবন অনাদি অনন্ত—ইহা যখনই জানিতে পারে, তখনই সে নদীতীরে বসিয়া, তোমরা যেমন সামান্য তৃণ-

খণ্ডকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পার, তদ্রূপ শরীরটাকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে পারে—যেন উহা কিছুই নয়। সেখানেই তাহাদের বীরত্ব—তাহারা মৃত্যুকে পরমাত্মীয় বলিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয়, কারণ, তাহারা নিশ্চিত জানে যে—তাহাদের মৃত্যু নাই। এখানেই তাহাদের শক্তি নিহিত—এই শক্তিবলেই শত শত বর্ষব্যাপী বৈদেশিক আক্রমণ ও অত্যাচারে তাহারা অক্ষত রহিয়াছে। এই জাতি এখনও জীবিত এবং এই জাতির ভিতর ভীষণতম দুঃখ-বিপদের দিনেও ধর্ম্মবীরের অভাব হয় নাই। পাশ্চাত্য-দেশ যেমন রাজনীতিবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত ও বিজ্ঞান-বীর প্রসব করিয়াছে, এশিয়াও তদ্রূপ ধর্ম্মবীর প্রসব করিয়াছেন। বর্ত্তমান (উনবিংশ) শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন ভারতে পাশ্চাত্যভাব প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে, যখন পাশ্চাত্য দিগ্বিজয়িগণ তরবারিহস্তে ঋষির বংশধরগণের নিকট প্রমাণ করিতে আসে যে—তাহারা বর্ব্বর, স্বপ্নমুগ্ধ জাতিমাত্র, তাহাদের ধর্ম্ম কেবল পৌরাণিক গল্পমাত্র আর ঈশ্বর, আত্মা ও অন্য যাহা কিছু পাইবার জন্য তাহারা এতদিন চেষ্টা করিতেছিল, কেবল অর্থশূন্য শব্দমাত্র আর এই সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া এই জাতি ক্রমাগত যে ত্যাগবৈরাগ্যের অভ্যাস করিয়া আসিয়াছে, সে সমুদয় বৃথা—তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের

মদীয় আচার্য্যদেব।

যুবকগণের মধ্যে এই প্রশ্ন বিচারিত হইতে লাগিল যে, তবে কি এত দিন পর্য্যন্ত এই সমগ্র জাতীয় জীবন যে ভাবে গঠিত হইয়াছে, ইহার একেবারেই সার্থকতা নাই, তবে কি আবার তাহাদিগকে পাশ্চাত্যপ্রণালী অনুসারে নূতনভাবে জীবন গঠন করিতে হইবে, তবে কি প্রাচীন পুঁথিপাটা সব ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে, দর্শনগ্রন্থগুলি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে, তাহাদের ধর্ম্মাচার্য্যগণকে তাড়াইয়া দিতে হইবে, মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে ?)

তরবারি ও বন্দুকের সাহায্যে নিজ ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণ করিতে সমর্থ বিজেতা পাশ্চাত্যজাতি যে বলিতেছেন, তোমাদের পুরাতন যাহা কিছু আছে, সবই কুসংস্কার, সবই পৌত্তলিকতা! পাশ্চাত্য প্রণালী অনুসারে পরিচালিত নূতন বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষিত বালকগণ অতি বাল্যকাল হইতেই এই সকল ভাবে অভ্যস্ত হইল, সুতরাং তাহাদের ভিতর যে সন্দেহের আবির্ভাব হইবে, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কিন্তু কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া প্রকৃতভাবে সত্যানুসন্ধান না হইয়া দাঁড়াইল এই যে, পাশ্চাত্যেরা যাহা বলে, তাহাই সত্য। পুরোহিতকুলের উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে, বেদরাশি পুড়াইয়া ফেলিতে হইবে—কেন না, পাশ্চাত্যেরা একথা বলিতেছে। এইরূপ সন্দেহ ও

অস্থিরতার ভাব হইতেই ভারতে তথা-কথিত সংস্কারের তরঙ্গ উঠিল।

যদি তুমি তোমার দেশের যথার্থ কল্যাণ করিতে চাও, তবে তোমার তিনটী জিনিষ থাকা চাইই চাই। প্রথমতঃ, হৃদয়বত্তা। তোমার ভাইদের জন্য যথার্থই কি তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে? জগতে এত দুঃখকষ্ট, এত অজ্ঞান, এত কুসংস্কার রহিয়াছে, ইহা কি তুমি যথার্থই প্রাণে প্রাণে অনুভব কর? সকল মানুষকে ভাই বলিয়া যথার্থই কি তোমার অনুভব হয়? তোমার সমগ্র অস্তিত্বটাই কি ঐ ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? উহা কি তোমার রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে? তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? উহা কি তোমার প্রত্যেক স্নায়ুর ভিতর ঝঙ্কার দিতেছে? তুমি কি এই সহানুভূতির ভাবে পূর্ণ হইয়াছ? যদি ইহা হইয়া থাকে, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তার পর চাই কৃতকর্ম্মতা —বল দেখি—তুমি দেশের কল্যাণের কোন নির্দ্দিষ্ট উপায় স্থির করিয়াছ কি?—জাতীয় ব্যাধির কোনরূপ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছ কি? তোমরা যে চীৎকার করিয়া সকলকে সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিতে বলিতেছ, তোমরা নিজেরা কি কোন পথ পাইয়াছ? হইতে পারে—প্রাচীন

মদীয় আচার্য্যদেব।

ভাবগুলি সব কুসংস্কারপূর্ণ, কিন্তু ঐ সকল কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য সত্য মিশ্রিত রহিয়াছে, নানাবিধ খাদের মধ্যে সুবর্ণখণ্ডসমূহ রহিয়াছে। এমন কোন উপায় কি আবিষ্কার করিয়াছ, যাহাতে খাদ বাদ দিয়া খাঁটি সোণাটুকু মাত্র লওয়া যাইতে পারে? যদি তাহাও করিয়া থাক, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি দ্বিতীয় সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। আরও একটি জিনিষের প্রয়োজন—প্রাণপণ অধ্যবসায়। তুমি যে দেশের কল্যাণ করিতে যাইতেছ, বল দেখি, তোমার আসল অভিসন্ধিটা কি? নিশ্চিত করিয়া কি বলিতে পার যে, কাঞ্চন, মানযশ বা প্রভুত্বের বাসনা তোমার এই দেশের হিতাকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে নাই? তুমি কি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পার, যদি সমগ্র জগৎ তোমাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তথাপি তোমার আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কায করিয়া যাইতে পার? তুমি কি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পার—তুমি কি চাও, তাহা জান—আর তোমার জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন হইলেও তোমার কর্ত্তব্য এবং সেই কর্ত্তব্যমাত্র সাধন করিয়া যাইতে পার? তুমি কি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার যে, যতদিন জীবন থাকিবে, যত দিন হৃদয়ের গতি সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ না হইবে, ততদিন অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া তোমার উদ্দেশ্যসাধনে লাগিয়া

থাকিবে? এই ত্রিবিধ গুণ যদি তোমার থাকে, তবেই তুমি প্রকৃত সংস্কারক, তবেই তুমি যথার্থ শিক্ষক, তবেই তুমি মানবজাতির পক্ষে মহামঙ্গলস্বরূপ, তবেই তুমি আমাদের নমস্য। কিন্তু লোকে বড়ই ব্যস্তবাগীশ, বড়ই সঙ্কীর্ণদৃষ্টি। তাহার অপেক্ষা করিয়া থাকিবার ধৈর্য্য নাই, তাহার প্রকৃত দর্শনের শক্তি নাই। সে এখনি ফল দেখিতে চায়। ইহার কারণ কি? কারণ এই,—এই ফল সে নিজেই ভোগ করিতে চায়, প্রকৃতপক্ষে অপরের জন্য তাহার বড় ভাবনা নাই। সে কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য করিতে চাহে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

—কর্ম্মেই তোমার অধিকার, ফলে কখনই অধিকার নাই।

ফলকামনা কর কেন? আমাদের কেবল কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে হইবে। ফল যাহা হইবার, হইতে দাও। কিন্তু মানুষের সহিষ্ণুতা নাই—এইরূপ ব্যস্তবাগীশ বলিয়া শীঘ্র শীঘ্র ফল ভোগ করিবে বলিয়া সে যাহা হউক একটা মতলব লইয়া তাহাতেই লাগিয়া যায়। জগতের অধিকাংশ সংস্কারককেই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করিতে পারা যায়।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতে এই সংস্কারের জন্য

মদীয় আচার্য্যদেব।

বিজাতীয় আগ্রহ আসিল। কিছুকালের জন্য বোধ হইল যে, যে জড়বাদ ও অহংসর্ব্বস্বতার তরঙ্গ ভারতের উপকূলে প্রবলবেগে আঘাত করিতেছে, তাহাতে আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে হৃদয়ের যে প্রবল অকপটতা, ঈশ্বর লাভের জন্য হৃদয়ের প্রবল আগ্রহ ও চেষ্টা পাইয়াছি, তাহা সব ভাসাইয়া দিবে। মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল, যেন সমগ্র জাতিটার অদৃষ্টে বিধাতা একেবারে ধ্বংস লিখিয়াছেন। কিন্তু এই জাতি এইরূপ সহস্র সহস্র বিপ্লব-তরঙ্গের আঘাত সহ্য করিয়া আসিয়াছে। তাহাদের সহিত তুলনায় এ তরঙ্গের বেগ ত অতি সামান্য। শত শত বর্ষ ধরিয়া তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসিয়া এই দেশকে বন্যায় ভাসাইয়া দিয়াছে, সম্মুখে যাহা পাইয়াছে, তাহাকেই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিয়াছে, তরবারি ঝলসিয়াছে এবং "আল্লার জয়" রবে ভারতগগন বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু পরে যখন বন্যা থামিল, দেখা গেল—জাতীয় আদর্শসমূহ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

ভারতীয় জাতি নষ্ট হইবার নহে। উহা মৃত্যুকে উপহাস করিয়া নিজ মহিমায় বিরাজিত রহিয়াছে এবং তত দিন থাকিবে, যতদিন উহার জাতীয় ভিত্তিস্বরূপ ধর্ম্মভাব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, যতদিন না ভারতের লোক ধর্ম্মকে ছাড়িয়া

বিষয়-সুখে উন্মত্ত হইবে, যতদিন না তাহারা ভারতের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিবে। ভিক্ষুক ও দরিদ্র হয়ত তাহারা চিরকাল থাকিবে, ময়লা ও মলিনতার মধ্যে হয়ত তাহাদিগকে চিরদিন থাকিতে হইবে, কিন্তু তাহারা যেন তাহাদের ঈশ্বরকে পরিত্যাগ না করে; তাহারা যে ঋষিদের বংশধর, একথা যেন ভুলিয়া না যায়। যেমন পাশ্চাত্যদেশে একটা মুটে মজুর পর্য্যন্ত মধ্যযুগের কোন দস্যু ব্যারণের বংশধর রূপে আপনাকে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করে, ভারতে তেমনি সিংহাসনারূঢ় সম্রাট্ পর্য্যন্ত অরণ্যবাসী, বল্কল-পরিহিত, আরণ্যফলমূলভোজী, ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ, অকিঞ্চন ঋষিগণের বংশধররূপে আপনাকে প্রমাণিত করিতে চেষ্টা করেন। আমরা এইরূপ ব্যক্তির বংশধর বলিয়া পরিচিত হইতেই চাই আর যতদিন পবিত্রতার উপর এইরূপ গভীর শ্রদ্ধা থাকিবে, ততদিন ভারতের বিনাশ নাই।]

[ভারতের চারিদিকে যখন এইরূপ নানাবিধ সংস্কার-চেষ্টা হইতেছিল, সেই সময়ে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি বঙ্গদেশের কোন সুদূর পল্লীগ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুলে একটি বালকের জন্ম হয়। পিতামাতা অতি নিষ্ঠাবান্ সেকেলে ধরণের লোক ছিলেন।) প্রাচীনতন্ত্রের প্রকৃত নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের জীবনটা নিত্য ত্যাগ ও তপস্যাময়।

মদীয় আচার্য্যদেব।

জীবিকানির্ব্বাহের জন্য তাঁহার পক্ষে খুব অল্প পথই উন্মুক্ত, তার উপর আবার নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণের পক্ষে কোন প্রকার বিষয়কর্ম্ম নিষিদ্ধ। আবার যার তার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবারও যো নাই। কল্পনা করিয়া দেখ—এরূপ জীবন কি কঠোর জীবন! তোমরা অনেকবার ব্রাহ্মণদের কথা ও তাহাদের পৌরোহিত্য ব্যবসার কথা শুনিয়াছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের মধ্যে কয়জন ভাবিয়া দেখিয়াছ, এই অদ্ভুত নরকুল কিরূপে তাহাদের প্রতিবেশিগণের উপর এরূপ প্রভুত্ব বিস্তার করিল? দেশের সকল জাতি অপেক্ষা তাহারা অধিক দরিদ্র আর ত্যাগই তাহাদের শক্তির রহস্য। তাহারা কখন ধনের আকাঙ্ক্ষা করে নাই। জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র পুরোহিতকুল তাহারাই আর তজ্জন্যই তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন। তাহারা নিজেরা এরূপ দরিদ্র বটে, তথাপি দেখিবে, যদি গ্রামে কোন দরিদ্র ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণপত্নী তাহাকে গ্রাম হইতে কখন অভুক্ত চলিয়া যাইতে দিবে না। ভারতে মাতার ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য আর যেহেতু তিনি মাতা—সেই হেতু তাঁহার কর্ত্তব্য—সকলকে খাওয়াইয়া সর্ব্বশেষে নিজে খাওয়া। প্রথমে তাঁহাকে দেখিতে হইবে, সকলে খাইয়া পরিতৃপ্ত

হইয়াছে, তবেই তিনি খাইতে পাইবেন। সেই হেতুই ভারতে জননীকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া থাকে। (আমরা যে ব্রাহ্মণীর কথা বলিতেছি, আমরা যাঁহার জীবনী বলিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাঁহার মাতা, এইরূপ আদর্শ হিন্দুজননী ছিলেন।) ভারতে যে জাতি যত উচ্চ, তাহার বাঁধাবাঁধিও সেইরূপ অধিক। খুব নীচ জাতিরা যাহা খুসি তাহাই খাইতে পারে, কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চতর জাতিসমূহে দেখিবে, আহারের নিয়মের বাঁধাবাঁধি রহিয়াছে আর উচ্চতম জাতি, ভারতের বংশানুক্রমিক পুরোহিত জাতি ব্রাহ্মণের জীবনে—আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, খুব বেশী বাঁধাবাঁধি। পাশ্চাত্য-দেশের আহার-ব্যবহারের তুলনায় তাহাদের জীবনটা ক্রমাগত তপস্যাময়। কিন্তু তাহাদের খুব দৃঢ়তা আছে। তাহারা কোন একটা ভাব পাইলে তাহার চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়ে না, আর বংশানুক্রমে উহার পোষণ করিয়া উহা কার্য্যে পরিণত করে। একবার উহাদিগকে কোন একটা ভাব দাও, সহজে উহা আর পরিবর্ত্তন করিতে পারিবে না, তবে তাহাদিগকে কোন নূতন ভাব দেওয়া বড় কঠিন।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরা এই কারণে অতিশয় সঙ্কীর্ণ, তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের সঙ্কীর্ণ ভাবপরিধির মধ্যে বাস করে। কিরূপে জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা আমাদের প্রাচীন

শাস্ত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত আছে, তাহারা সেই সকল বিধি-নিষেধের সামান্য খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত বজ্রদৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে। তাহারা বরং উপবাস করিয়া থাকিবে, তথাপি তাহাদের স্বজাতির ক্ষুদ্র অবান্তর বিভাগের বহির্ভূত কোন ব্যক্তির হাতে খাইবে না। এইরূপ সঙ্কীর্ণ হইলেও তাহাদের ঐকান্তিকতা ও প্রবল নিষ্ঠা আছে। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদের ভিতর অনেক সময় এইরূপ প্রবল বিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব দেখা যায়, কারণ, তাহাদের এই দৃঢ় ধারণা আছে যে, উহা সত্য, আর তাহা হইতেই তাহাদের নিষ্ঠা উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহারা এরূপ অধ্যবসায়ের সহিত যাহাতে লাগিয়া থাকে, আমরা সকলে উহাকে ঠিক বলিয়া মনে না করিতে পারি, কিন্তু তাহাদের মতে উহা সত্য (আমাদের শাস্ত্রে লিখিত আছে, দয়া ও দানশীলতার চূড়ান্ত সীমায় যাওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্যক্তি অপরকে সাহায্য করিতে, সেই ব্যক্তির জীবন রক্ষা করিতে গিয়া নিজে অনশনে দেহত্যাগ করে, শাস্ত্র বলেন, উহা অন্যায় নহে; বরং উহা করাই মানুষের কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে নিজের মৃত্যুর ভয় না রাখিয়া সম্পূর্ণভাবে দানব্রতের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা ভারতীয় সাহিত্যের সহিত সুপরিচিত, তাঁহারা এইরূপ চূড়ান্ত দানশীলতার দৃষ্টান্তস্বরূপ

একটী প্রাচীন মনোহর উপাখ্যানের কথা স্মরণ করিতে পারিবেন। মহাভারতে লিখিত আছে, একটী অতিথিকে ভোজন করাইতে গিয়া কিরূপে একটী সমগ্র পরিবার অনশনে প্রাণ দিয়াছিল। ইহা অতিরঞ্জিত নহে, কারণ, এখনও এরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে দেখিতে পাওয়া যায়। মদীয় আচার্য্যদেবের পিতামাতার চরিত্র এই আদর্শানুযায়ী ছিল। তাঁহারা খুব দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় কোন দরিদ্র অতিথিকে খাওয়াইতে গিয়া গৃহিণী সারাদিন উপবাস করিয়া থাকিতেন। এইরূপ পিতামাতা হইতে এই শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন—আর জন্ম হইতেই ইঁহাতে একটু বিশেষত্ব, একটু অসাধারণত্ব ছিল। জন্ম হইতেই তাঁহার পূর্ব্ববৃত্তান্ত স্মরণ হইত, কি কারণে তিনি জগতে আসিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেন, আর সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাঁহার সমুদয় শক্তি প্রযুক্ত হইল। অল্প বয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং তিনি পাঠশালায় প্রেরিত হন। ব্রাহ্মণ-সন্তানকে পাঠশালায় যাইতেই হয়। ব্রাহ্মণের লেখাপড়ার কাজ ছাড়া অন্য কাজে অধিকার নাই। ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী, যাহা এখনও দেশের অনেক স্থানে প্রচলিত, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের সংস্কৃত শিক্ষা—আধুনিক প্রণালী হইতে অনেক পৃথক্। সেই শিক্ষাপ্রণালীতে ছাত্রগণকে

বেতন দিতে হইত না। তাঁহাদের এই ধারণা ছিল, জ্ঞান এতদূর পবিত্র বস্তু যে, কাহারও উহা বিক্রয় করা উচিত নয়। কোন মূল্য না লইয়া অবাধে জ্ঞান বিতরণ করিতে হইবে। আচার্য্যেরা ছাত্রগণকে বিনা বেতনে নিজেদের নিকট রাখিতেন, আর শুধু তাহাই নহে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ছাত্রগণকে অশনবসন প্রদান করিতেন। এই সকল আচার্য্যের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য বড়লোকেরা বিবাহশ্রাদ্ধাদি বিশেষ বিশেষ সময়ে তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিতেন। বিশেষ বিশেষ দানের অধিকারী বলিয়া তাঁহারা বিবেচিত হইতেন এবং তাঁহাদিগকে আবার তাঁহাদের ছাত্রগণকে প্রতিপালন করিতে হইত। যে বালকটীর কথা আমি বলিতেছি, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা একজন পণ্ডিতলোক ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকট পাঠ আরম্ভ করিলেন। অল্পদিন পরে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে, সমুদয় লৌকিক বিদ্যার উদ্দেশ্য— কেবল সাংসারিক উন্নতি। সুতরাং তিনি লেখাপড়া ছাড়িয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানান্বেষণে সম্পূর্ণরূপে জীবন সমর্পণ করিতে সংকল্প করিলেন। পিতার মৃত্যুর পর সংসারে প্রবল দারিদ্র্য আসিল, এই বালককে নিজের আহারের সংস্থানের চেষ্টা করিতে হইল। তিনি কলিকাতার সন্নিকটে একটী স্থানে যাইয়া তথাকার মন্দিরের পুরোহিত

নিযুক্ত হইলেন।)মন্দিরের পৌরোহিত্যকর্ম্ম ব্রাহ্মণের পক্ষে বড় নিন্দনীয় বলিয়া. বিবেচিত হইয়া থাকে। আমাদের মন্দির, তোমরা যে অর্থে চার্চ্চ শব্দ ব্যবহার কর, তদ্রূপ নহে। উহারা সাধারণ উপাসনার স্থান নহে, কারণ, ভারতে সাধারণ উপাসনা বলিয়া কিছু নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধনী ব্যক্তিরা পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য মন্দির করিয়া দেয়।

বিষয়-সম্পত্তি যাহার বেশী আছে, সে এইরূপ মন্দির করিয়া দেয়। সেই মন্দিরে সে কোনরূপ ঈশ্বরপ্রতীক বা ঈশ্বরাবতারের প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করে এবং ভগবানের নামে উহা পূজার জন্য উৎসর্গ করে। রোমান ক্যাথলিক চার্চ্চে যেরূপ "মাস" (Mass) হইয়া থাকে, এই সকল মন্দিরেও কতকটা তদ্রূপ ভাবে পূজা হয়—শাস্ত্র হইতে মন্ত্রশ্লোকাদি পাঠ হয়, প্রতিমার সম্মুখে আলো ঘুরান হয়, মোট কথা, যেমন আমরা একজন বড় লোকের সম্মান করি, প্রতিমার প্রতি ঠিক তদ্রূপ আচরণ করা হয়। মন্দিরে কায হয় এই পর্য্যন্ত। যে ব্যক্তি কখন মন্দিরে যায় না, তাহা অপেক্ষা যে মন্দিরে যায়, মন্দিরে যাওয়ার দরুণ সে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয় না। বরং যে কখন মন্দিরে যায় না, সেই অধিকতর ধার্ম্মিক বলিয়া বিবেচিত

হয়,কারণ,ভারতে ধর্ম্ম প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব, আর লোকে নিজ গৃহে নির্জ্জনেই নিজ আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সমুদয় উপাসনাদি নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে মন্দিরে পৌরোহিত্য নিন্দনীয় কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন অর্থবিনিময়ে বিদ্যাদানই যখন নিন্দার্হ কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন ধর্ম্ম সম্বন্ধে এ তত্ত্ব যে আরও অধিক প্রযুজ্য, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র—মন্দিরের পুরোহিত যখন বেতন লইয়া কার্য্য করে, তখন সে এই সকল পবিত্র বিষয় লইয়া ব্যবসা করিতেছে বলিতে হইবে। অতএব যখন দারিদ্র্যের নিমিত্ত বাধ্য হইয়া এই বালককে তাহার পক্ষে জীবিকার একমাত্র উপায়স্বরূপ মন্দিরের পৌরোহিত্য কর্ম্ম অবলম্বন করিতে হইল, তখন তাহার মনের ভাব কিরূপ হইল, কল্পনা করিয়া দেখ।

বাঙ্গালা দেশে অনেক কবি হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত গীত সাধারণ লোকের মধ্যে খুব প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় এবং সকল পল্লীগ্রামে সেই সকল সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্ম্মসঙ্গীত আর সেই গুলির সার ভাব এই যে—ধর্ম্মকে সাক্ষাৎ অনুভব করিতে হইবে, আর—সম্ভবতঃ এই

ভাবটী ভারতীয় ধর্ম্মসমূহের বিশেষত্ব। ভারতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন কোন গ্রন্থ নাই, যাহাতে এই ভাব নাই। মানুষকে ঈশ্বর সাক্ষাৎ করিতে হইবে, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে হইবে, তাঁহাকে দেখিতে হইবে, তাঁহার সহিত কথা কহিতে হইবে। ইহাই ধর্ম্ম। অনেক সাধুপুরুষের ঈশ্বর-দর্শন-কাহিনী ভারতের সর্ব্বত্র শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ মতবাদসমূহই তাঁহাদের ধর্ম্মের ভিত্তি। আর প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদি এইরূপ আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা ব্যক্তিগণের লিখিত। বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির জন্য ঐ গ্রন্থগুলি লিখিত হয় নাই, কোনরূপ যুক্তি দ্বারাই উহা-দিগকে বুঝিবার উপায় নাই। কারণ, তাঁহারা নিজেরা কতকগুলি বিষয় দেখিয়া তবে তাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আর যাহারা আপনাদিগকে ঐরূপ উচ্চভাবাপন্ন করিয়াছে, তাহারাই কেবল ঐ সকল তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। তাঁহারা বলেন, ইহজীবনেই এরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভব, আর সকলেরই ইহা হইতে পারে। মানবের এই শক্তি খুলিয়া গেলেই ধর্ম্ম আরম্ভ হয়। সকল ধর্ম্মেরই ইহাই সার কথা, আর এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, একজনের খুব ভাল বক্তৃতা দিবার শক্তি আছে, তাহার যুক্তিসমূহ অকাট্য, আর সে খুব উচ্চ উচ্চ ভাব প্রচার করিতেছে;

মদীয় আচার্য্যদেব।

তথাপি তাহার কথা কেহ শুনে না—আর একজন অতি সামান্য ব্যক্তি, নিজের মাতৃভাষাই হয় ত ভাল করিয়া জানে না, কিন্তু তাহার জীবদ্দশায় তাহার দেশের অর্দ্ধেক লোক তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করিতেছে। ভারতে এরূপ হয় যে, যখন কোনরূপে লোকে জানিতে পারে যে, কোন ব্যক্তির এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতি হইয়াছে, ধর্ম্ম তাহার পক্ষে আর আন্দাজের বিষয় নহে, ধর্ম্ম, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর প্রভৃতি গুরুতর বিষয় লইয়া সে আর অন্ধকারে হাতড়াইতেছে না, তখন চারিদিক্ হইতে লোকে তাহাকে দেখিতে আসে। ক্রমে লোকে তাহাকে পূজা করিতে আরম্ভ করে।

(পূর্ব্বকথিত মন্দিরে আনন্দময়ী মাতার একটী মূর্ত্তি ছিল। এই বালককে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে তাঁহার পূজা নির্ব্বাহ করিতে হইত। এইরূপ করিতে করিতে এই এক ভাব আসিয়া তাঁহার মনকে অধিকার করিল যে, "এই মূর্ত্তির ভিতর কিছু বস্তু আছে কি? ইহা কি সত্য যে, জগতে এই আনন্দময়ী মা আছেন? ইহা কি সত্য যে, তিনি সত্য সত্যই আছেন ও এই ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়মন করিতেছেন? না, এ সব স্বপ্নতুল্য মিথ্যা? ধর্ম্মের মধ্যে কিছু সত্য আছে কি?"

তিনি শুনিয়াছিলেন যে, অতীতকালে অনেক বড় বড় সাধু মহাপুরুষ এইরূপে তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য প্রাণ-পণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং অবশেষে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফলও হইয়াছে। তিনি শুনিয়াছিলেন, ভারতের সকল ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য—সেই জগন্মাতার সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি। তাঁহার সমুদয় মন প্রাণ যেন সেই একভাবে তন্ময় হইয়া গেল। কিরূপে তিনি জগন্মাতাকে লাভ করিবেন, এই এক চিন্তাই তাঁহার মনে প্রবল হইতে লাগিল। আর ক্রমশঃ তাঁহার এই ভাব বাড়িতে লাগিল—শেষে তিনি—'কিরূপে মায়ের দর্শন পাইব'—ইহা ছাড়া আর কিছু বলিতে বা শুনিতে পারিতেন না।

সকল হিন্দু বালকের ভিতরই এই সন্দেহ আসিয়া থাকে। এই সন্দেহই আমাদের দেশের বিশেষত্ব—আমরা যাহা করিতেছি, তাহা সত্য কি? কেবল মতবাদে আমাদের তৃপ্তি হইবে না। অথচ ঈশ্বর-সম্বন্ধে যত মতবাদ এ পর্য্যন্ত হইয়াছে, ভারতে সেই সমুদয়ই আছে। শাস্ত্র বা মতে আমাদিগকে কিছুতেই তৃপ্ত করিতে পারিবে না। আমাদের দেশের সহস্র সহস্র ব্যক্তির মনে এইরূপ প্রত্যক্ষানুভূতির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া থাকে। এ কথা কি সত্য যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন? যদি থাকেন

মদীয় আচার্য্যদেব।

তবে আমি কি তাঁহাকে দেখিতে পাইতে পারি? আমি কি সত্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম? পাশ্চাত্যজাতীয়েরা এগুলিকে কেবল কল্পনা—কাযের কথা নয়, মনে করিতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহাই বিশেষ কাযের কথা। এই ভাব আশ্রয় করিয়া লোকে নিজেদের জীবন বিসর্জ্জন করিবে। এই ভাবের জন্য প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র হিন্দু গৃহ পরিত্যাগ করে এবং অতিশয় কঠোর তপস্যা করাতে অনেকে মরিয়া যায়। পাশ্চাত্য জাতির মনে ইহা আকাশে ফাঁদ পাতার ন্যায় বোধ হইবে আর তাহারা যে কেন এই-রূপ মত অবলম্বন করে, তাহারও কারণ আমি অনায়াসে বুঝিতে পারি। তথাপি যদিও আমি পাশ্চাত্যদেশে অনেক দিন বসবাস করিলাম, কিন্তু ইহাই আমার জীবনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সত্য—কাযের জিনিষ বলিয়া মনে হয়।

জীবনটা ত মুহূর্ত্তের জন্য—তা তুমি রাস্তার মুটেই হও আর লক্ষ লক্ষ লোকের দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সম্রাট্‌ই হও। জীবন ত ক্ষণভঙ্গুর—তা তোমার স্বাস্থ্য খুব ভালই হউক, অথবা তুমি চিররুগ্নই হও। হিন্দু বলেন, এ জীবনসমস্যার একমাত্র মীমাংসা আছে—ঈশ্বরলাভ, ধর্ম্মলাভই এই সমস্যার একমাত্র মীমাংসা। যদি এইগুলি সত্য হয়, তবেই জীবনরহস্যের ব্যাখ্যা হয়, জীবনভার দুর্ব্বহ হয় না,

জীবনটাকে সম্ভোগ করা সম্ভব হয়। তাহা না হইলে জীবনটা একটা বৃথা ভারমাত্র। ইহাই আমাদের ধারণা, কিন্তু শত শত যুক্তিদ্বারাও ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে প্রমাণ করা যায় না। যুক্তিবলে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্ভবপর বলিয়া অবধারিত হইতে পারে, কিন্তু ঐখানেই শেষ। সত্যসকলকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে, আর ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাইতে গেলে উহাকে সাক্ষাৎকার করিতে হইবে। ঈশ্বর আছেন, এইটি নিশ্চয় করিয়া বুঝিতে হইলে ঈশ্বরকে অনুভব করিতে হইবে। নিজে প্রত্যক্ষ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে আমাদের নিকট ধর্ম্মের সত্যতা প্রমাণিত হইতে পারে না।

বালকের হৃদয়ে এই ধারণা প্রবেশ করিল, তাঁহার সারা দিন কেবল ঐ ভাবনা—কিসে প্রত্যক্ষ দর্শন হইবে। প্রতিদিন তিনি কাঁদিয়া বলিতেন, "মা, সত্যই কি তুমি আছ, না, এ সব কবিকল্পনা? কবিরা ও ভ্রান্ত জনগণই কি এই আনন্দময়ী জননীর কল্পনা করিয়াছেন, অথবা সত্যই কিছু আছে?" আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমরা যে অর্থে শিক্ষা শব্দ ব্যবহার করি, তাহা তাঁহার কিছুই ছিল না; ইহাতে বরং ভালই হইয়াছিল। অপরের ভাব, অপরের চিন্তা ক্রমাগত লইয়া লইয়া তাঁহার মনের যে স্বাভাবিকত্ব ছিল, মনের যে স্বাস্থ্য ছিল, তাহা নষ্ট হইয়া যায় নাই। তাঁহার মনের

মদীয় আচার্য্যদেব।

এই প্রধান চিন্তা দিন দিন বাড়িতে লাগিল, শেষে এমন হইল যে, তিনি আর কিছু ভাবিতে পারিতেন না। উহা ছাড়া নিয়মিতরূপে পূজা করা, সব খুঁটিনাটি নিয়ম পালন করা— এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল। সময়ে সময়ে তিনি ঠাকুরকে ভোগ দিতে ভুলিয়া যাইতেন, কখন কখন আরতি করিতে ভুলিতেন, আবার সময়ে সময়ে সব ভুলিয়া ক্রমাগত আরতি করিতেন। তিনি লোকমুখে ও শাস্ত্রমুখে শুনিয়াছিলেন, যাহারা ব্যাকুলভাবে ভগবান্‌কে চায়, তাহারাই পাইয়া থাকে। এক্ষণে তাঁহার ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য সেই প্রবল আগ্রহ আসিল। অবশেষে তাঁহার পক্ষে মন্দিরের নিয়মিত পূজা করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। তিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী পঞ্চবটীতে গিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের এই ভাগ সম্বন্ধে তিনি আমাকে অনেকবার বলিয়াছেন, "কখন্ সূর্য্য উদয় হইল কখন্ বা অস্ত গেল, তাহা আমি জানিতে পারিতাম না।" তিনি নিজের দেহভাব একেবারে ভুলিয়া গেলেন, তাঁহার আহার করিবার কথাও স্মরণ থাকিত না। এই সময়ে তাঁহার জনৈক আত্মীয় তাঁহাকে খুব যত্নপূর্ব্বক সেবা-শুশ্রূষা করিতেন, তিনি ইঁহার মুখে জোর করিয়া খাবার দিতেন, অজ্ঞাতসারে কতকটা উদরস্থ হইত। তিনি উচ্চৈঃ-

স্বরে কাঁদিয়া বলিতেন, "মা মা, তুই কি সত্য সত্যই আছিস্? তুই কি যথার্থই সত্য? তুই যদি যথার্থই থাকিস্, তবে আমাকে কেন মা অজ্ঞানে ফেলে রেখেছিস্? আমাকে সত্য কি, তা জান্তে দিচ্ছিস্ না কেন? আমি তোকে সাক্ষাৎ দর্শন কর্ত্তে পাচ্ছি না কেন? লোকের কথা, শাস্ত্রের কথা, ষড়্-দর্শন—এসব পড়ে শুনে কি হবে মা? এ সবই মিছে। সত্য, যথার্থ সত্য যা, আমি তা সাক্ষাৎ উপলব্ধি কর্ত্তে চাই। সত্য অনুভব কর্ত্তে, তাকে স্পর্শ কর্ত্তে আমি চাই।"

এইরূপে সেই বালকের দিনরাত্রি চলিয়া যাইতে লাগিল। দিবাবসানে সন্ধ্যাকালে যখন মন্দিরের আরতির শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, তাঁহার মন তখন অতিশয় ব্যাকুল হইত, তিনি কাঁদিতেন ও বলিতেন, "মা, আর এক দিন বৃথা চলিয়া গেল, এখনও তোমার দেখা পাইলাম না। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের আর এক দিন চলিয়া গেল, আমি সত্যকে জানিতে পারিলাম না।" অন্তঃকরণের প্রবল যন্ত্রণায় তিনি কখন কখন মাটিতে মুখ ঘষড়াইয়া কাঁদিতেন।

মনুষ্যহৃদয়ে এইরূপ প্রবল ব্যাকুলতা আসিয়া থাকে। শেষাবস্থায় এই ব্যক্তি আমাকে বলিয়াছিলেন, "বৎস, মনে কর, একটা ঘরে এক থলি মোহর রহিয়াছে, আর তার

মদীয় আচার্য্যদেব।

পাশের ঘরে একটা চোর রহিয়াছে, তুমি কি মনে কর, সেই চোরের নিদ্রা হইবে? তাহার নিদ্রা হইতেই পারে না। তাহার মনে ক্রমাগত এই উদয় হইবে যে, কি করিয়া ঐ ঘরে ঢুকিয়া মোহরের থলিটা লইব? তাই যদি হয়, তবে তুমি কি মনে কর, যাহার এই দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, এই সকল আপাত-প্রতীয়মান বস্তুর পশ্চাতে সত্য রহিয়াছে, ঈশ্বর বলিয়া একজন আছেন, অবিনাশী একজন আছেন, এমন একজন আছেন, যিনি অনন্ত আনন্দস্বরূপ, যে আনন্দের সহিত তুলনা করিলে ইন্দ্রিয়-সুখ সব ছেলেখেলা বলিয়া বোধ হয়, সে কি তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা না করিয়া স্থির থাকিতে পারে? এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি সে এ চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে? তাহা কখনই হইতে পারে না। সে উহা লাভের জন্য উন্মত্ত হইবে।" সেই বালকের হৃদয়ে এই ভগবদুন্মত্ততা প্রবেশ করিল। সে সময়ে তাঁহার কোন গুরু ছিল না, এমন কেহ ছিল না যে, তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর কিছু সন্ধান দেয়, কিন্তু সকলেই মনে করিত, তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছে। সাধারণে ত এইরূপ বলিবেই। যদি কেহ সংসারের অসার বিষয়সমূহ পরিত্যাগ করে, লোকে তাহাকে উন্মত্ত বলে, কিন্তু এইরূপ লোকই যথার্থ সংসারের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এইরূপ

পাগ্‌লামী হইতেই জগৎ-আলোড়নকারী শক্তির উদ্ভব হইয়াছে, আর ভবিষ্যতেও এইরূপ পাগ্‌লামী হইতেই শক্তি উদ্ভূত হইয়া জগৎকে আলোড়িত করিবে। এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস সত্যলাভের জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টায় কাটিল। তখন তিনি নানাবিধ অলৌকিক দৃশ্য, অদ্ভুত রূপ দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার নিজ স্বরূপের রহস্য তাঁহার নিকট ক্রমশঃ উদ্‌ঘাটিত হইতে লাগিল। যেন আবরণের পর আবরণ অপসারিত হইতে লাগিল। জগন্মাতা নিজেই গুরু হইয়া এই বালককে তাঁহার অন্বেষিত সত্যপ্রাপ্তির সাধনে দীক্ষিত করিলেন। এই সময়ে সেই স্থানে পরমা সুন্দরী, পরমা বিদুষী এক মহিলা আসিলেন। শেষাবস্থায় এই মহাত্মা তাহার সম্বন্ধে বলিতেন যে, বিদুষী বলিলে তাঁহাকে ছোট করা হয়—তিনি বিদ্যা মূর্ত্তিমতী। যেন সাক্ষাৎ দেবী সরস্বতী মানবাকার ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। এই মহিলার বিষয় আলোচনা করিলেও তোমরা ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষত্ব কোন্‌খানে, তাহা বুঝিতে পারিবে। সাধারণতঃ হিন্দু-রমণীগণ যেরূপ অজ্ঞানান্ধকারে বাস করে এবং পাশ্চাত্য-দেশে যাহাকে স্বাধীনতার অভাব বলে, তাহার মধ্যেও এইরূপ উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবসম্পন্ন রমণীর অভ্যুদয় সম্ভব হইয়াছিল।

মদীয় আচার্য্যদেব।

তিনি একজন সন্ন্যাসিনী ছিলেন—কারণ, ভারতে স্ত্রীলোকেরাও বিষয়-সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া বিবাহ না করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় জীবন সমর্পণ করে। তিনি এই মন্দিরে আসিয়াই যেমন শুনিলেন যে, একটী বালক দিন রাত ঈশ্বরের নামে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে আর লোকে তাহাকে পাগল বলিয়া থাকে, অমনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহিলেন আর ইঁহার নিকট হইতেই তিনি প্রথম সহায়তা পাইলেন। তিনি একেবারেই তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার ন্যায় যাহার উন্মাদ আসিয়াছে, সে ধন্য। সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই পাগল—কেহ ধনের জন্য, কেহ সুখের জন্য, কেহ নামের জন্য, কেহ বা অন্য কিছুর জন্য পাগল। সেই ব্যক্তিই ধন্য, যে ঈশ্বরের জন্য পাগল। এইরূপ ব্যক্তি বড়ই অল্প।" এই মহিলা বালকটীর নিকট অনেক বর্ষ ধরিয়া থাকিয়া তাঁহাকে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীর সাধন শিখাইতে লাগিলেন, নানাপ্রকারের যোগসাধন শিখাইলেন এবং যেন এই বেগবতী ধর্ম্ম-স্রোতস্বতীর গতিকে নিয়মিত ও প্রণালী-বদ্ধ করিলেন।

কিছুদিন পরে তথায় একজন পরম পণ্ডিত ও দর্শন-শাস্ত্রবিৎ সন্ন্যাসী আসিলেন। তিনি মায়াবাদী ছিলেন—

তিনি বিশ্বাস করিতেন, জগতের প্রকৃতপক্ষে অস্তিত্ব নাই; আর তিনি ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গৃহে বাস করিতেন না, রৌদ্র ঝড় বর্ষা সকল সময়েই তিনি বাহিরে থাকিতেন। তিনি ইঁহাকে বেদান্ত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু শীঘ্রই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, শিষ্য গুরু অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। তিনি কয়েক মাস ধরিয়া তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়া চলিয়া গেলেন। পূর্ব্বোক্ত রমণীটীও ইতিপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছিলেন। যখনই বালকের হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইতে আরম্ভ হইল, অমনি তিনি চলিয়া গেলেন। আর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে অথবা তিনি এখনও জীবিত আছেন, তাহা কেহই জানে না। তিনি আর ফিরেন নাই।

মন্দিরের পূজারী অবস্থায় যখন তাঁহার অদ্ভুত পূজা-প্রণালী দেখিয়া লোকে তাঁহার একটু মাথার গোল হইয়াছে স্থির করিয়াছিল, তখন তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহাকে দেশে লইয়া গিয়া একটী অল্পবয়স্কা বালিকার সহিত বিবাহ দিল—মনে করিল, ইহাতেই তাঁহার চিত্তের গতি ফিরিয়া যাইবে, মাথার গোল আর থাকিবে না। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তিনি ফিরিয়া আসিয়া ভগবান্‌কে লইয়া আরও মাতিলেন। অবশ্য তাঁহার যেরূপ বিবাহ হইল, উহাকে



৩

ঠিক বিবাহ নাম দেওয়া যায় না। যখন স্ত্রী একটু বড় হয়, তখনই প্রকৃত বিবাহ হইয়া থাকে আর এই সময়ে স্বামীর শ্বশুরালয়ে গিয়া স্ত্রীকে নিজগৃহে লইয়া আসাই প্রথা। এ ক্ষেত্রে কিন্তু স্বামী একেবারে ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্ত্রী আছে। সুদূর পল্লীতে থাকিয়া বালিকাটী শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার স্বামী ধর্ম্মোন্মাদ হইয়া গিয়াছেন, এমন কি, অনেকে তাঁহাকে পাগল বলিয়াই বিবেচনা করিতেছেন। তিনি স্থির করিলেন, এ কথার সত্যতা জানিতে হইবে—তাই তিনি বাহির হইয়া তাঁহার স্বামী যথায় আছেন, পদব্রজে তথায় যাইলেন। অবশেষে যখন তিনি স্বামীর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন না। যদিও ভারতে নরনারী যে কেহ ধর্ম্মজীবন অবলম্বন করে, তাহারই আর কাহারও সহিত কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না, তথাপি ইনি স্ত্রীকে দূর করিয়া না দিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন ও বলিলেন, "আমি জানিয়াছি, সকল রমণীই আমার জননী; তথাপি আমি, এখন তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিতে প্রস্তুত আছি।"

এই মহিলা বিশুদ্ধস্বভাবা ও অতিশয় উচ্চাশয়া ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বামীর মনোভাব সব বুঝিয়া তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি করিতে সমর্থা ছিলেন। তিনি কালবিলম্ব না

করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "আমার আপনাকে জোর করিয়া সংসারী করিবার ইচ্ছা নাই, আমি কেবল আপনার নিকট থাকিয়া আপনার সেবা করিতে ও আপনার নিকট সাধন ভজন শিখিতে চাই।" তিনি তাঁহার একজন প্রধান অনুগত শিষ্যা হইলেন—তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে ভক্তি-পূজা করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার স্ত্রীর অনুমতি পাইয়া তাঁহার শেষ বাধা অপসারিত হইল—তখন তিনি স্বাধীন হইয়া নিজ রুচি অনুযায়ী মার্গে বিচরণ করিতে সক্ষম হইলেন।

যাহা হউক, ইনি এইরূপে সাংসারিক বন্ধনমুক্ত হই-লেন—এতদিনে তিনি সাধনায়ও অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে প্রথমেই তাঁহার হৃদয়ে এই আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল যে, কিরূপে তিনি সম্পূর্ণরূপে অভিমানবিবর্জ্জিত হইবেন, আমি ব্রাহ্মণ, ও ব্যক্তি শূদ্র বলিয়া নিজের যে জাত্যভিমান আছে, কিরূপে উহা সমূলে উৎপাটিত করিবেন, কিরূপে তিনি অতি হীনতম জাতির সঙ্গে পর্য্যন্ত আপনার সমত্ব বোধ করিবেন। আমাদের দেশে যে জাতিভেদ প্রথা আছে, তাহাতে বিভিন্ন মানবের মধ্যে যে পদমর্য্যাদায় ভেদ, তাহা স্থির ও চিরনির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যে বংশে বা যে জাতিতে জন্মগ্রহণ করে, এইরূপ জন্মবশেই সে

সামাজিক পদমর্য্যাদাবিশেষ লাভ করে, আর যত দিন না সে কোন গুরুতর অন্যায় কর্ম্ম করে, তত দিন সে সেই পদমর্য্যাদা বা জাতিভ্রষ্ট হয় না। জাতিসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণ সর্ব্বোচ্চ ও চণ্ডাল সর্ব্বনিম্ন। সুতরাং যাহাতে আপনাকে কাহারও অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান না থাকে, এই কারণে এই ব্রাহ্মণসন্তান চণ্ডালের কার্য্য করিয়া তাহার সহিত নিজের অভেদ বুদ্ধি আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। চণ্ডালের কার্য্য—রাস্তা সাফ করা, ময়লা সাফ করা—তাহাকে কেহই স্পর্শ করে না। এইরূপ চণ্ডালের প্রতিও যাহাতে তাঁহার ঘৃণাবুদ্ধি না থাকে, এই উদ্দেশে তিনি গভীর রাত্রে উঠিয়া তাহাদের ঝাড়ু ও অন্যান্য যন্ত্র লইয়া মন্দিরের নর্দ্দামা পায়খানা প্রভৃতি নিজ হস্তে পরিষ্কার করিতেন ও পরে নিজ দীর্ঘকেশের দ্বারা সেই স্থান মুছিয়া দিতেন। শুধু যে এইরূপেই তিনি হীনত্ব স্বীকার করিতেন, তাহা নহে। মন্দিরে প্রত্যহ অনেক ভিক্ষুককে প্রসাদ দেওয়া হইত—তাহাদের মধ্যে আবার অনেক মুসলমান, পতিত ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও থাকিত। তিনি সেই সব কাঙ্গালীদের খাওয়া হইলে তাহাদের পাতা উঠাইতেন, তাহাদের ভুক্তাবশিষ্ট জড় করিতেন, তাহা হইতে কিছু স্বয়ং গ্রহণ করিয়া অবশেষে যেখানে এইরূপ

ছত্রিশ বর্ণের লোক বসিয়া খাইয়াছে, সেই স্থান পরিষ্কার করিতেন। আপনারা এই শেষোক্ত ব্যাপারটীতে যে কি অসাধারণত্ব আছে, ইহা দ্বারা বিশেষ কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, তাহা বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু ভারতে আমাদের নিকট ইহা বড়ই অদ্ভুত ও স্বার্থত্যাগের কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। এই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কারকার্য্য নীচ অস্পৃশ্য জাতিরাই করিয়া থাকে। তাহারা কোন সহরে প্রবেশ করিলে নিজের জাতির পরিচয় দিয়া লোককে সাবধান করিয়া দেয়—যাহাতে তাহারা তাহার স্পর্শদোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে। প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থে লিখিত আছে, যদি ব্রাহ্মণ হঠাৎ এইরূপ নীচজাতির মুখ দেখিয়া ফেলে, তবে তাহাকে সারাদিন উপবাসী থাকিয়া একসহস্র গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। এই সকল শাস্ত্রীয় নিষেধবাক্য সত্ত্বেও এই ব্রাহ্মণোত্তম নীচজাতির খাইবার স্থান পরিষ্কার করিতেন, তাহাদের ভুক্তাবশেষ ভগবৎপ্রসাদ জ্ঞানে ধারণ করিতেন, শুধু কি তাহাই, রাত্রে গোপনে উঠিয়া ময়লা পরিষ্কার করিয়া তাহাদের সহিত আপনার সমত্ব বোধ করিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁহার এই ভাব ছিল যে, আমি যে যথার্থই সমগ্র মানবজাতির সেবকস্বরূপ হইয়াছি, ইহা দেখাইবার জন্য আমায় তোমার বাড়ীর ঝাড়ুদার হইতে হইবে।

মদীয় আচার্য্যদেব।

•

তার পর ইঁহার অন্তরে এই প্রবল পিপাসা হইল যে, বিভিন্ন ধর্ম্মপ্রণালীতে কি সত্য আছে, তাহা জানিবেন। এ পর্য্যন্ত তিনি নিজের ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছু জানিতেন না। এক্ষণে তাঁহার বাসনা হইল, অন্যান্য ধর্ম্ম কিরূপ তাহা জানিবেন। আর তিনি যাহা কিছু করিতেন, তাহাই সর্ব্বান্তঃকরণে অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং তিনি অন্যান্য ধর্ম্মের গুরু খুঁজিতে লাগিলেন। গুরু বলিতে ভারতে আমরা কি বুঝি, এটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। গুরু বলিতে শুধু কেতাবকীট বুঝায় না ; বুঝায়—যিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি সাক্ষাৎ সত্যকে জানিয়াছেন—অপর কাহারও নিকট শুনিয়া নহে। তিনি জনৈক মুসলমান সাধু পাইয়া তাঁহার প্রদর্শিত সাধনপ্রণালী অনুসারে সাধন করিতে লাগিলেন। তিনি মুসলমানদিগের মত পোষাক পরিতে লাগিলেন, মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুযায়ী সমুদয় অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, সেই সময়ের জন্য তিনি সম্পূর্ণরূপে মুসলমান হইয়া গেলেন। আর তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, তিনি যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, এই সকল সাধনপ্রণালীর অনুষ্ঠানও ঠিক সেই অবস্থায় পৌঁছাইয়া দেয়। তিনি যীশুখ্রীষ্টের সত্যধর্ম্মের অনুসরণ করিয়াও সেই একই ফললাভ করিলেন। তিনি যে কোন সম্প্রদায়

সম্মুখে পাইলেন, তাহাদেরই নিকট গিয়া তাহাদের সাধন-প্রণালী লইয়া সাধন করিলেন, আর তিনি যে কোন সাধন করিতেন, সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাকে সেই সেই সম্প্রদায়ের গুরুরা যেরূপ যেরূপ করিতে বলিতেন, তিনি তাহার যথাযথ অনুষ্ঠান করিতেন, আর সকল ক্ষেত্রেই তিনি একই প্রকার ফললাভ করিতেন। এইরূপে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই একই উদ্দেশ্য—সকলেই সেই একই জিনিষ শিক্ষা দিতেছে—প্রভেদ প্রধানতঃ সাধনপ্রণালীতে, আরো অধিক প্রভেদ ভাষায়। ভিতরে সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্ম্মেরই সেই এক উদ্দেশ্য।

তার পর তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল, সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে একেবারে লিঙ্গজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন; কারণ, আত্মার কোন লিঙ্গ নাই, আত্মা পুরুষও নহেন, স্ত্রীও নহেন। লিঙ্গভেদ কেবল দেহেই বিদ্যমান আর যিনি সেই আত্মাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার লিঙ্গভেদ থাকিলে চলিবে না। তিনি নিজে পুরুষদেহধারী ছিলেন—এক্ষণে তিনি সর্ব্ব বিষয়ে এই স্ত্রীভাব আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি নিজেকে রমণী বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায় বেশ করিলেন, স্ত্রীলোকের ন্যায়

মদীয় আচার্য্যদেব।

কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, পুরুষের কায সব ছাড়িয়া দিলেন, নিজ পরিবারের রমণীমণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন,—এইরূপে অনেক বর্ষ ধরিয়া সাধন করিতে করিতে তাঁহার মন পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, তাঁহার লিঙ্গ-জ্ঞান একেবারে দূর হইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে কামের বীজ পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গেল—তাঁহার নিকট জীবনটা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গেল।

আমরা পাশ্চাত্য প্রদেশে নারীপূজার কথা শুনিয়া থাকি, কিন্তু সাধারণতঃ এই পূজা নারীর সৌন্দর্য্য ও যৌবনের পূজা। ইনি কিন্তু নারীপূজা বলিতে বুঝিতেন, সকল নারীই সেই আনন্দময়ী মা ব্যতীত অন্য কিছু নহেন—তাঁহারই পূজা। আমি নিজে দেখিয়াছি, সমাজ যাহা-দিগকে স্পর্শ করিবে না, তিনি এরূপ স্ত্রীলোকদের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, শেষে কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদের পদতলে পতিত হইয়া অর্দ্ধবাহ্যশূন্য অবস্থায় বলিতেছেন, "মা, একরূপে তুমি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছ, আর একরূপে তুমি সমগ্র জগৎ হইয়াছ। আমি তোমাকে প্রণাম করি, মা, আমি তোমাকে প্রণাম করি।" ভাবিয়া দেখ, সেই জীবন কিরূপ ধন্য, যাঁহা হইতে সর্ব্ববিধ পশু-ভাব চলিয়া গিয়াছে, যিনি প্রত্যেক রমণীকে ভক্তিভাবে

দর্শন করিতেছেন, যাঁহার নিকট সকল নারীর মুখ অন্য আকার ধারণ করিয়াছে, কেবল সেই আনন্দময়ী ভগবতী জগদ্ধাত্রীর মুখ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। ইহাই আমাদের প্রয়োজন। তোমরা কি বলিতে চাও, রমণীর মধ্যে যে ঈশ্বরত্ব রহিয়াছে, তাহাকে ঠকাইতে পারা যায়? তাহা কখন হয় নাই, হইতেও পারে না। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে উহা সর্ব্বদাই আত্মপ্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে। উহা অব্যর্থভাবেই সমুদয় জুয়াচুরি কপটতা ধরিয়া ফেলে, উহা অভ্রান্তভাবে সত্যের তেজ, আধ্যাত্মিকতার আলোক ও পবিত্রতার শক্তি উপলব্ধি করিয়া থাকে। যদি প্রকৃত ধর্ম্মলাভ করিতে হয়, তবে এইরূপ পবিত্রতা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অত্যাবশ্যক।

এই ব্যক্তির জীবনে এইরূপ কঠোর, সর্ব্বদোষ-বিরহিত পবিত্রতা আসিল। আমাদের জীবনে যে সকল প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবের সহিত সংঘর্ষ রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে তাহা আর রহিল না। তিনি অতি কষ্টে ধর্ম্মধন সঞ্চয় করিয়া মানবজাতিকে দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন তাঁহার কার্য্য আরম্ভ হইল। তাঁহার প্রচারকার্য্য ও উপদেশদান আশ্চর্য্য ধরণের। আমাদের দেশে আচার্য্যের খুব সম্মান, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর জ্ঞান করা হয়। আচার্য্যকে

যেরূপ সম্মান করা হয়, পিতামাতাকেও আমরা সেরূপ সম্মান করি না। পিতামাতা হইতে আমরা দেহ পাইয়াছি। কিন্তু আচার্য্য আমাদিগকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। আমরা তাঁহার সন্তান, তাঁহার মানসপুত্র। কোন অসাধারণ আচার্য্যের অভ্যুদয় হইলে সকল হিন্দুই তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আইসে, লোকে তাঁহাকে ঘেরিয়া তাঁহার নিকট ভিড় করিয়া বসিয়া থাকে। কিন্তু এই আচার্য্যবরের, লোকে তাঁহাকে সম্মান করিল কি না, এ বিষয়ে কোন খেয়ালই ছিল না, তিনি যে একজন আচার্য্যশ্রেষ্ঠ তাহা তিনি নিজেই জানিতেন না। তিনি জানিতেন—মাই সব করিতেছেন, তিনি কিছুই নহেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "যদি আমার মুখ দিয়া কোন ভাল কথা বাহির হয়, তাহা আমার মায়ের কথা, আমার তাহাতে কোন গৌরব নাই।" তিনি তাঁহার নিজ প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা পোষণ করিতেন এবং মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত এ ধারণা ত্যাগ করেন নাই। আমরা দেখিয়াছি, সংস্কারক ও সমালোচকদের কার্য্যপ্রণালী কিরূপ। তাঁহারা অপরের কেবল দোষ দেখান, সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়া নিজেদের কল্পিত নূতন ভাবে নূতন করিয়া গড়িতে যান। আমরা সকলেই নিজের নিজের মনোমত এক একটা কল্পনা লইয়া বসিয়া

আছি। দুঃখের বিষয়, কেহই তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে প্রস্তুত নহে, কারণ, আমাদের মত অপর সকলেই উপদেশ দিতে প্রস্তুত। তাঁহার কিন্তু সে ভাব ছিল না, তিনি কাহাকেও ডাকিতে যাইতেন না। তাঁহার এই মূলমন্ত্র ছিল—প্রথমে চরিত্র গঠন কর, প্রথমে আধ্যাত্মিক ভাব উপার্জ্জন কর, ফল আপনি আসিবে। তাঁহার প্রিয় দৃষ্টান্ত এই ছিল—"যখন কমল প্রস্ফুটিত হয়, তখন ভ্রমরগণ আপনাপনিই মধু খুঁজিতে আসিয়া থাকে। এইরূপে যখন তোমার হৃৎপদ্ম ফুটিবে, তখন শত শত লোক তোমার নিকট শিক্ষা লইতে আসিবে।" এইটী জীবনের এক মহতী শিক্ষা। মদীয় আচার্য্যদেব আমাকে শত শত বার ইহা শিখাইয়াছেন, তথাপি আমি প্রায়ই ইহা ভুলিয়া যাই। খুব কম লোকেই চিন্তার অদ্ভুত শক্তি বুঝিতে পারে। যদি কোন ব্যক্তি গুহায় বসিয়া উহার দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া দিয়া যথার্থ একটি মাত্রও মহৎ চিন্তা করিয়া মরিতে পারে, সেই চিন্তা সেই গুহার প্রাচীর ভেদ করিয়া সমগ্র আকাশে বিচরণ করিবে, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতির হৃদয়ে ঐ ভাব সংক্রামিত হইবে। চিন্তার এইরূপ অদ্ভুত শক্তি। অতএব তোমার ভাব অপরকে দিবার জন্য ব্যস্ত হইও না। প্রথমে দিবার মত কিছু সঞ্চয় কর। তিনিই প্রকৃত শিক্ষা দিতে পারেন,

মদীয় আচার্য্যদেব।

যাঁহার কিছু দিবার আছে; কারণ, শিক্ষাপ্রদান বলিতে কেবল বচন বুঝায় না, উহা কেবল মতামত বুঝান নহে; শিক্ষাপ্রদান অর্থে বুঝায় ভাব-সঞ্চার। যেমন আমি তোমাকে একটি ফুল দিতে পারি, তদপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষভাবে ধর্ম্মও দেওয়া যাইতে পারে। ইহা কবিত্বের ভাষায় বলিতেছি না, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। ভারতে এই ভাব অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদ্যমান, আর পাশ্চাত্য প্রদেশে যে 'প্রেরিতগণের গুরুশিষ্যপরম্পরা' ( Apostolic succession ) মত প্রচলিত আছে, তাহাতেই ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অতএব প্রথমে চরিত্র গঠন কর—এইটিই তোমার প্রথম কর্ত্তব্য। আগে নিজে সত্য কি তাহা জান, পরে অনেকে তোমার নিকট শিখিবে, তাহারা সব তোমার নিকট আসিবে। মদীয় আচার্য্যদেবের ইহাই ভাব ছিল, তিনি কাহারও সমালোচনা করিতেন না।

বৎসর বৎসর ধরিয়া দিবারাত্র আমি এই ব্যক্তির সহিত বাস করিয়াছি, কিন্তু তাঁহার জিহ্বা কোন সম্প্রদায়ের নিন্দাসূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে, শুনি নাই। সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই তাঁহার সমান সহানুভূতি ছিল। তিনি উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখিয়াছিলেন। মানুষ হয় জ্ঞানপ্রবণ, না হয় ভক্তিপ্রবণ, না হয় যোগপ্রবণ,

না হয় কর্ম্মপ্রবণ হইয়া থাকে। বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহে এই বিভিন্ন ভাবসমূহের কোন না কোনটির প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তথাপি এক ব্যক্তিতে এই চারিটী ভাবের বিকাশই সম্ভব এবং ভবিষ্যৎ মানব ইহা করিতে সমর্থ হইবে। ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল। তিনি কাহারও দোষ দেখিতেন না, সকলের মধ্যে ভালই দেখিতেন। একদিন আমার বেশ স্মরণ আছে, কোন ব্যক্তি ভারতীয় কোন সম্প্রদায়ের নিন্দা করিতেছেন—এই সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠানাদি নীতিবিগর্হিত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তিনি কিন্তু তাহাদেরও নিন্দা করিতে প্রস্তুত নহেন—তিনি স্থিরভাবে কেবলমাত্র বলিলেন—কেউ বা সদর দরজা দিয়া বাড়ীতে ঢোকে, কেউ বা আবার পাইখানার দোর দিয়ে ঢুকতে পারে। এইরূপে ইহাদের মধ্যেও ভাল লোক থাকিতে পারে। আমাদের কাহাকেও নিন্দা করা উচিত নয়। তাঁহার দৃষ্টি কুসংস্কারশূন্য নির্ম্মল হইয়া গিয়াছিল। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ভাব, তাহাদের ভিতরের কথাটা তিনি সহজেই ধরিতে পারিতেন। তিনি নিজ অন্তরের মধ্যে এই সকল বিভিন্ন ভাব একত্র করিয়া সামঞ্জস্য করিতে পারিতেন।

সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই অপূর্ব্ব মানুষকে দেখিতে,

মদীয় আচার্য্যদেব।

তাঁহার সরল গ্রাম্য ভাষায় উপদেশ শুনিতে আসিতে লাগিল। তিনি যাহা বলিতেন, তাহার প্রত্যেক কথাতেই একটা শক্তি মাখান থাকিত, প্রত্যেক কথাই হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিয়া দিত। কথায় কিছু নাই, ভাষাতেও কিছু নাই; যে ব্যক্তি সেই কথা বলিতেছে, তাহার সত্তা তিনি যাহা বলেন তাহাতে জড়াইয়া থাকে, তাই কথায় জোর হয়। আমরা সকলেই সময়ে সময়ে ইহা অনুভব করিয়া থাকি। আমরা খুব বড় বড় বক্তৃতা শুনিয়া থাকি, উত্তম সুযুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব সকল শুনিয়া থাকি, তার পর বাড়ী গিয়া সব ভুলিয়া যাই। আবার অন্য সময়ে হয়ত অতি সরল ভাষায় দুই চারিটী কথা শুনিলাম—সেগুলি আমাদের প্রাণে এমন লাগিল যে, সারা জীবনের জন্য সেই কথাগুলি আমাদের হৃদয়ে গাঁথিয়া গেল, আমাদের অঙ্গীভূত হইয়া গেল, স্থায়ী ফল প্রসব করিল। যে ব্যক্তি তাঁহার কথাগুলিতে নিজের সত্তা, নিজের জীবন প্রদান করিতে পারেন, তাঁহারই কথার ফল হয়, কিন্তু তাঁহার মহাশক্তি-সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার শিক্ষার অর্থ ই আদানপ্রদান—আচার্য্য দিবেন, শিষ্য গ্রহণ করিবেন। কিন্তু আচার্য্যের কিছু দিবার বস্তু থাকা চাই, শিষ্যেরও গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হওয়া চাই।

এই ব্যক্তি ভারতের রাজধানী, আমাদের দেশের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র, যেখান হইতে প্রতি বৎসর শত শত সন্দেহবাদী ও জড়বাদীর সৃষ্টি হইতেছিল, সেই কলিকাতার নিকট বাস করিতে লাগিলেন, কিন্তু অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী, অনেক সন্দেহবাদী, অনেক নাস্তিক তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার কথা শুনিতেন।

আমি বাল্যকাল হইতেই সত্যের অনুসন্ধান করিতাম। আমি বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সমূহের সভায় যাইতাম। যখন দেখিতাম, কোন ধর্ম্মপ্রচারক বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া অতি মনোহর উপদেশ দিতেছেন, তাঁহার বক্তৃতাবসানে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসিতাম, "এই যে সব কথা বলিলেন, তাহা কি আপনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি দ্বারা জানিয়াছেন, অথবা উহা কেবল আপনার বিশ্বাসমাত্র? ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে আপনি নিশ্চিতরূপে কি কিছু জানিয়াছেন?" তাঁহারা উত্তরে বলিতেন—"এসকল আমার মত ও বিশ্বাস।" অনেককে আমি এই প্রশ্ন করিয়াছিলাম যে, "আপনি কি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" কিন্তু তাঁহাদের উত্তর শুনিয়া ও তাঁহাদের ভাব দেখিয়া আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে,তাঁহারা ধর্ম্মের নামে লোক ঠকাইতেছেন মাত্র। আমার এখানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কৃত একটী শ্লোক মনে পড়িতেছে,—

বাগ্ বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

বিভিন্ন প্রকার বাক্যযোজনার রীতি, শাস্ত্রব্যাখ্যার কৌশল এবং পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্য ভোগের জন্য; উহা দ্বারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পা[illegible],

এইরূপে আমি ক্রমশঃ নাস্তিক হইয়া পড়িতেছিলাম, এমন সময়ে এই আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ্ক আমার ভাগ্যগগনে উদিত হইলেন। আমি এই ব্যক্তির কথা শুনিয়া তাঁহার উপদেশ শুনিতে গেলাম। তাঁহাকে একজন সাধারণ লোকের মত বোধ হইল, কিছু অসাধারণত্ব দেখিলাম না। তিনি অতি সরল ভাষায় কথা কহিতেছিলেন, আমি ভাবিলাম, এ ব্যক্তি একজন বড় ধর্ম্মাচার্য্য কিরূপে হইতে পারে? আমি তাঁহার নিকটে গিয়া সারা জীবন ধরিয়া অপরকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলাম—"মহাশয়, আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?" তিনি উত্তর দিলেন—"হাঁ"। "মহাশয়, আপনি কি তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিতে পারেন?" "হাঁ"। "কি প্রমাণ?" "আমি তোমাকে যেমন আমার সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহাকেও ঠিক সেইরূপ দেখিতেছি, বরং আরও স্পষ্টতর, আরও উজ্জ্বলতররূপে দেখিতেছি।" আমি একেবারে

মুগ্ধ হইলাম। এই প্রথম আমি এমন লোক দেখিলাম, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিলেন, আমি ঈশ্বর দেখিয়াছি, ধর্ম্ম সত্য—উহা অনুভব করা যাইতে পারে—আমরা এই জগৎ যেমন প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা অপেক্ষা ঈশ্বরকে অনন্তগুণ স্পষ্টতররূপে প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। এ একটা তামাসার কথা নয় অথবা ইহা মানুষের করা একটা গড়াপেটা জিনিষ নয়, ইহা বাস্তবিক সত্য। আমি দিনের পর দিন এই ব্যক্তির নিকট আসিতে লাগিলাম। অবশ্য সকল কথা আমি এখন বলিতে পারি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি—ধর্ম্ম যে দেওয়া যাইতে পারে, তাহা আমি বাস্তবিক প্রত্যক্ষ করিলাম। একবার স্পর্শে, একবার দৃষ্টিতে, একটা সমগ্র জীবন পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। আমি এইরূপ ব্যাপার বার বার হইতে দেখিয়াছি। আমি বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, মহম্মদ ও প্রাচীনকালের বিভিন্ন মহাপুরুষগণের বিষয় পাঠ করিয়াছিলাম—তাঁহারা উঠিয়া বলিলেন—সুস্থ হও, আর সে ব্যক্তি সুস্থ হইয়া গেল। আমি এখন দেখিলাম, ইহা সত্য আর যখন আমি এই ব্যক্তিকে দেখিলাম, আমার সকল সন্দেহ ভাসিয়া গেল। ধর্ম্মদান সম্ভব, আর মদীয় আচার্য্যদেব বলিতেন, "জগতের অন্যান্য জিনিষ যেমন দেওয়া নেওয়া যায়, ধর্ম্ম তদপেক্ষা অধিকতর

মদীয় আচার্য্যদেব।

প্রত্যক্ষভাবে দেওয়া নেওয়া যাইতে পারে।" অতএব আগে ধার্ম্মিক হও, দিবার মত কিছু অর্জ্জন কর, তার পর জগতের সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহা দাও গিয়া। ধর্ম্ম বাক্যাড়ম্বর নহে, অথবা মতবাদবিশেষ নহে অথবা সাম্প্রদায়িকতা নহে। সম্প্রদায়ে বা সমাজে ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম— আত্মার সহিত পরমাত্মার সম্বন্ধ লইয়া। উহা লইয়া সমাজ কি হইবে? কোন ধর্ম্ম কি কখন কোন সমিতি বা সঙ্ঘ দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে? ঐরূপ সমাজ করিলে ধর্ম্ম ব্যবসাদারিতে পরিণত হয় আর যেখানে এইরূপ ব্যবসাদারি ঢোকে, সেখানেই ধর্ম্মের লোপ। এশিয়াই জগতের সকল ধর্ম্মের প্রাচীন জন্মভূমি। উহাদের মধ্যে এমন একটী ধর্ম্মের নাম কর, যাহা প্রণালীবদ্ধ সঙ্ঘের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে। এরূপ একটীরও তুমি নাম করিতে পারিবে না। ইউরোপই এই উপায়ে ধর্ম্ম-প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল আর সেই জন্যই উহা এশিয়ার মত কখনই সমগ্র জগতে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যা ছুটাইতে পারে নাই। কতকগুলি ভোটের সংখ্যাধিক্য হইলেই কি মানুষ অধিক ধার্ম্মিক হইবে, অথবা উহার সংখ্যাল্পতায় কম ধার্ম্মিক হইবে? মন্দির বা চার্চ্চ নির্ম্মাণ অথবা সমবেত উপাসনায় যোগ দিলেই ধর্ম্ম হয় না। অথবা কোন গ্রন্থে

বা বচনে বা বক্তৃতায় বা সঙ্ঘে ধর্ম্ম নাই। ধর্ম্মের মোট কথা—অপরোক্ষানুভূতি। আর আমরা সকলে প্রত্যক্ষই দেখিতেছি, আমরা যতক্ষণ না নিজেরা সত্যকে জানিতেছি, ততক্ষণ কিছুতেই আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমরা যতই তর্ক করি না কেন, আমরা যতই শুনি না কেন, কেবল একটী জিনিষেই আমাদের সন্তোষ হইতে পারে—তাহা এই—আমাদের নিজেদের প্রত্যক্ষানুভূতি আর এই প্রত্যক্ষানুভূতি সকলের পক্ষেই সম্ভব, কেবল উহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপে ধর্ম্ম প্রত্যক্ষানুভব করিবার প্রথম সোপান—ত্যাগ। যতদূর পার, ত্যাগ করিতে হইবে। অন্ধকার ও আলোক, বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ দুই কখন একত্র অবস্থান করিতে পারে না। "তোমরা ঈশ্বর ও শয়তানকে এক সঙ্গে সেবা করিতে পার না।"

মদীয় আচার্য্যদেবের নিকট আমি আর একটী বিষয় শিক্ষা করিয়াছি। উহাই আমার বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয়—এই অদ্ভুত সত্য যে, জগতের ধর্ম্মসমূহ পরস্পর বিরোধী নহে। উহারা এক সনাতন ধর্ম্মেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এক সনাতন ধর্ম্ম চিরকাল ধরিয়া রহিয়াছে, চিরকালই থাকিবে, আর এই ধর্ম্মই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন

মদীয় আচার্য্যদেব।

ভাবে প্রকাশিত হইতেছে।" অতএব আমাদিগকে সকল ধর্ম্মকে সম্মান করিতে হইবে, আর যতদূর সম্ভব, সমুদয় গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। ধর্ম্ম কেবল যে বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন দেশ অনুসারে বিভিন্ন হয়, তাহা নহে, পাত্র হিসাবেও উহা বিভিন্ন ভাব ধারণ করে। কোন ব্যক্তির ভিতর ধর্ম্ম তীব্র কর্ম্মশীলতারূপে প্রকাশিত, কাহাতেও প্রবলা ভক্তি, কাহাতেও যোগ, কাহাতেও বা জ্ঞানরূপে প্রকাশিত। 'তুমি যে পথে যাইতেছ, তাহা ঠিক নহে,' একথা বলা ভুল। এইটী করিতেই হইবে—এই মূল রহস্যটী শিখিতে হইবে—সত্য একও বটে, বহুও বটে, বিভিন্ন দিক্ দিয়া দেখিলে একই সত্যকে আমরা বিভিন্ন ভাবে দেখিতে পারি। তাহা হইলেই কাহারও প্রতি বিরোধ পোষণ না করিয়া আমরা সকলের প্রতি অনন্ত সহানুভূতি-সম্পন্ন হইব। যতদিন পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, ততদিন এক আধ্যাত্মিক সত্যই বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে, এইটী বুঝিলে অবশ্যই আমাদের পরস্পরের বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি করিতে সমর্থ হইব। যেমন প্রকৃতি বলিতে বহুত্বে একত্ব বুঝায়, ব্যবহারিক জগতে অনন্ত ভেদ, কিন্তু এই সমুদয় ভেদের পশ্চাতে

অনন্ত, অপরিণামী, নিরপেক্ষ একত্ব রহিয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর ব্যষ্টি—সমষ্টির ক্ষুদ্রাকারে পুনরাবৃত্তিমাত্র। এই সমুদয় ভেদ সত্ত্বেও ইহাদেরই মধ্যে অনন্ত একত্ব বিরাজমান—আর ইহাই আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। অন্যান্য ভাব অপেক্ষা এই ভাবটী আজ-কালকার দিনে আমার বিশেষ প্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়। আমি এমন এক দেশের লোক, যেখানে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্ত নাই—সেখানে দুর্ভাগ্যবশতঃই হউক বা সৌভাগ্য-বশতঃই হউক, যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্ম লইয়া একটু নাড়াচাড়া করে, সেই একজন প্রতিনিধি পাঠাইতে চায়—আমি এমন দেশে জন্মিয়াছি বলিয়া অতি বাল্যকাল হইতেই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহের সহিত পরিচিত। এমন কি, মর্ম্মনেরা (Mormons) * পর্য্যন্ত ভারতে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আসিয়াছিল। আসুক সকলে। সেই ত ধর্ম্ম-

* ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে জোসেফ স্মিথ নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এই সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। ইহারা বাইবেলের মধ্যে একটী নূতন অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহারা অলৌকিক ক্রিয়া করিতে পারেন বলিয়া দাবী করেন এবং পাশ্চাত্য সমাজের রীতিবিরুদ্ধ এক পত্নী সত্ত্বেও বহুবিবাহ-প্রথার পক্ষপাতী।

প্রচারের স্থান। অন্যান্য দেশাপেক্ষা সেখানেই ধর্ম্মভাব অধিক বদ্ধমূল হয়। তোমরা আসিয়া হিন্দুদিগকে যদি রাজনীতি শিখাইতে চাও, তাহারা বুঝিবে না, কিন্তু যদি তুমি আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার কর, উহা যতই কিম্ভুতকিমাকার ধরণের হউক না কেন, অল্পকালের মধ্যেই সহস্র সহস্র লোক তোমার অনুসরণ করিবে আর তোমার জীবদ্দশায় তোমার সাক্ষাৎ ভগবান্ রূপে পূজিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহাতে আমি আনন্দই বোধ করি, কারণ, ইহাতে স্পষ্ট জানাইয়া দিতেছে যে, ভারতে আমরা এই এক বস্তুই চাহিয়া থাকি। হিন্দুদের মধ্যে নানাবিধ সম্প্রদায় আছে, তাহাদের সংখ্যাও অনেক, আবার তাহাদের মধ্যে কতকগুলিকে আপাততঃ এত বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় যে, উহাদের মিলিবার যেন কোন ভিত্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তথাপি তাহারা সকলেই বলিবে, উহারা এক ধর্ম্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥"

"যেমন বিভিন্ন নদীসমূহ বিভিন্ন পর্ব্বতসমূহে উৎপন্ন হইয়া, ঋজু কুটিল নানা পথে প্রবাহিত হইয়া অবশেষে সমুদয়ই সমুদ্রে আসিয়া মিলিয়া যায়, তদ্রূপ বিভিন্ন

সম্প্রদায়ের ভাব বিভিন্ন হইলেও সকলেই অবশেষে তোমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।" ইহা শুধু একটা মতবাদ নহে, ইহা কার্য্যে স্বীকার করিতে হইবে—তবে আমরা সচরাচর যেমন দেখিতে পাই, কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া অপর ধর্ম্মে কিছু সত্য আছে বলেন, সেরূপ ভাবে নহে। 'হাঁ, হাঁ, এতে কতকগুলি বড় ভাল জিনিষ আছে বটে।' ( আবার কাহারও কাহারও এই অদ্ভুত উদার ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্যান্য ধর্ম্ম ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ক্রমবিকাশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্নস্বরূপ, কিন্তু "আমাদের ধর্ম্মে উহা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে" )। একজন বলিতেছে, আমার ধর্ম্মই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কেন না উহা সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্ম, আবার অপর একজন তাহার ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক বলিয়াও সেই একই দাবী করিতেছে। আমাদের বুঝিতে হইবে ও স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই মুক্তি দিবার শক্তি সমান আছে। মন্দিরে বা চার্চ্চে উহাদের প্রভেদ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহা কুসংস্কার মাত্র। সেই একই ঈশ্বর সকলের ডাকে সাড়া দেন আর তুমি, আমি বা অপর কতকগুলি লোক একজন অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মার রক্ষণ ও উদ্ধারের জন্যও দায়ী নহে, সেই এক সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরই

সকলের জন্য দায়ী। আমি বুঝিতে পারি না, লোকে কিরূপে একদিকে আপনাদিগকে ঈশ্বর-বিশ্বাসী বলিয়া ঘোষণা করে, আবার ইহাও ভাবে যে, ঈশ্বর একটী ক্ষুদ্র লোকসমাজের ভিতর সমুদয় সত্য দিয়াছেন আর তাঁহারাই অবশিষ্ট মানবসমাজের রক্ষকস্বরূপ। কোন ব্যক্তির বিশ্বাস নষ্ট করিবার চেষ্টা করিও না। যদি পার, তাহাকে কিছু ভাল জিনিষ দাও। যদি পার, তবে মানুষ যেখানে অবস্থিত আছে, তথা হইতে তাহাকে একটু উপরে ঠেলিয়া দাও। ইহাই কর, কিন্তু তাহার যাহা আছে, তাহা নষ্ট করিও না। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য্য নামের যোগ্য, যিনি আপনাকে এক মুহূর্ত্তে যেন সহস্র সহস্র বিভিন্ন ব্যক্তিতে পরিণত করিতে পারেন। কেবল তিনিই যথার্থ আচার্য্য, যিনি অল্পায়াসেই শিষ্যের অবস্থায় আপনাকে লইয়া যাইতে পারেন—যিনি নিজ আত্মা শিষ্যের আত্মায় সংক্রামিত করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া দেখিতে পান, তাহার কান দিয়া শুনিতে পান, তাহার মন দিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপ আচার্য্যই যথার্থ শিক্ষা দিতে পারেন, অপর কেহ নহে। যাঁহারা কেবল অপরের ভাব ভাঙ্গিয়া দিবার চেষ্টা করেন,

তাঁহারা কখনই কোন উপকার করিতে পারেন না।

মদীয় আচার্য্যদেবের নিকট থাকিয়া আমি বুঝিয়াছি, মানুষ এই দেহেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিতে পারে। তদীয় মুখ হইতে কাহারও প্রতি অভিশাপ বর্ষিত হয় নাই, এমন কি, তিনি কাহারও সমালোচনা পর্য্যন্ত করিতেন না। তদীয় নয়ন জগতে কিছু মন্দ দেখিবার শক্তি হারাইয়াছিল—তাঁহার মনও কোনরূপ কুচিন্তায় অসমর্থ হইয়াছিল। তিনি ভাল ছাড়া আর কিছু দেখিতেন না। সেই মহা পবিত্রতা, মহা ত্যাগই ধর্ম্মলাভের একমাত্র গুহ্য উপায়। বেদ বলেন—

"ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ।"

"—ধন বা পুত্রোৎপাদনের দ্বারা নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তিলাভ করা যায়।" যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "তোমার যাহা কিছু আছে, বিক্রয় করিয়া দরিদ্রদিগকে দান কর ও আমার অনুসরণ কর।"

সব বড় বড় আচার্য্য ও মহাপুরুষগণও এই কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং জীবনে উহা পরিণত করিয়াছেন। এই ত্যাগ ব্যতীত আধ্যাত্মিকতা আসিবার সম্ভাবনা কোথায়? যেখানেই হউক না, সকল ধর্ম্মভাবের পশ্চাতেই ত্যাগ রহিয়াছে আর যতই ত্যাগের ভাব

কমিয়া যায়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ততই ধর্ম্মের ভিতর ঢুকিতে থাকে আর ধর্ম্মভাবও সেই পরিমাণে কমিয়া যায়। এই ব্যক্তি ত্যাগের সাকার মূর্ত্তিস্বরূপ ছিলেন। আমাদের দেশে যাহারা সন্ন্যাসী হয়, তাহাদিগকে সমুদয় ধন ঐশ্বর্য্য মান সম্ভ্রম ত্যাগ করিতে হয় আর মদীয় আচার্য্যদেব এই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। তিনি কাঞ্চন স্পর্শ করিতেন না; এমন কি, তাঁহার কাঞ্চনত্যাগ-স্পৃহা তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলীর উপর পর্য্যন্ত এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, নিদ্রিতাবস্থায়ও তাঁহার দেহে কোন ধাতুদ্রব্য স্পর্শ করাইলে তাঁহার মাংসপেশীসমূহ সঙ্কুচিত হইয়া যাইত এবং তাঁহার সমুদয় দেহটা যেন ঐ ধাতুদ্রব্যকে স্পর্শ করিতে অস্বীকার করিত। এমন অনেকে ছিল, যাহাদের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিলে তাহারা কৃতার্থ বোধ করিত, যাহারা আনন্দের সহিত তাঁহাকে সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রদানে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু যদিও তাঁহার উদার হৃদয় সকলকে আলিঙ্গন করিতে সদা প্রস্তুত ছিল, তথাপি তিনি এই সব লোকের নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেন। কাম-কাঞ্চন সম্পূর্ণ জয়ের তিনি এক জীবন্ত উদাহরণ। এই দুই

ভাব তাঁহার ভিতর কিছুমাত্র ছিল না আর এই শতাব্দীর জন্য এইরূপ লোকসকলের অতিশয় প্রয়োজন। এখনকার কালে লোকে যাহাকে আপনাদের 'প্রয়োজনীয় দ্রব্য' বলে, তাহা ব্যতীত একমাসও বাঁচিতে পারিবে না—মনে করে, আর এই প্রয়োজন তাহারা অতিরিক্ত-রূপে বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে—এই আজকালকার দিনে এই ত্যাগের প্রয়োজন। এইরূপ কালে এমন একজন লোকের প্রয়োজন—যিনি জগতের অবিশ্বাসী-দের নিকট প্রমাণ করিতে পারেন যে, এখনও এমন লোক আছে, যে সংসারের সমুদয় ধনরত্ন ও মান-যশের জন্য বিন্দুমাত্র লালায়িত নহে। বাস্তবিকই এখনও এরূপ অনেক লোক আছেন।

তাঁহার জীবনে আদৌ বিশ্রাম ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রথমাংশ ধর্ম্ম উপার্জ্জনে ও শেষাংশ উহার বিত-রণে ব্যয়িত হইয়াছিল। দলে দলে লোক তাঁহার উপ-দেশ শুনিতে আসিত আর তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২০ ঘণ্টা তাহাদের সঙ্গে কথা কহিতেন আর এরূপ ঘটনা দুই এক দিনের জন্য ঘটিত, তাহা নহে; মাসের পর মাস এরূপ হইতে লাগিল; অবশেষে এরূপ কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার মানবজাতির প্রতি

এরূপ অগাধ প্রেম ছিল যে, যাহারা তাঁহার কৃপালাভার্থ আসিত, এরূপ সহস্র সহস্র লোকের মধ্যে অতি সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার কৃপালাভে বঞ্চিত হইত না। ক্রমে গলায় একটা ঘা হইল, তথাপি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়াও কথা বন্ধ করা গেল না। আমরা তাঁহার নিকট সর্ব্বদা থাকিতাম, তাঁহার কষ্ট যাহাতে না হয়, এই কারণে লোকজনের সঙ্গে তিনি যাহাতে দেখা না করেন, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু যখনই তিনি শুনিতেন, লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে তাঁহার কাছে আসিতে দিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতেন এবং তাহারা আসিলে তাহাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতেন। যদি কেহ বলিত, "এই সব লোকজনের সঙ্গে কথা কহিলে আপনার কষ্ট হইবে না?"—তিনি হাসিয়া এই মাত্র উত্তর দিতেন,—"কি! দেহের কষ্ট! আমার কত দেহ হইল, কত দেহ গেল। যদি এ দেহটা পরের সেবায় যায়, তবে ত ইহা ধন্য হইল। যদি একজন লোকেরও যথার্থ উপকার হয়, তাহার জন্য আমি হাজার হাজার দেহ দিতে প্রস্তুত আছি।" একবার এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিল, "মহাশয়, আপনি ত একজন মস্ত যোগী—

আপনি আপনার দেহের উপর একটু মন রাখিয়া ব্যারামটা সারাইয়া ফেলুন না।” প্রথমে তিনি ইহার কোন উত্তর দিলেন না, অবশেষে যখন ঐ ব্যক্তি আবার সেই কথা তুলিলেন, তিনি আস্তে আস্তে বলিলেন, “তোমাকে আমি একজন জ্ঞানী মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি দেখিতেছি, অপর সংসারী লোকেদের মত কথা বলিতেছ। এই মন ভগবানের পাদপদ্মে অর্পিত হইয়াছে—তুমি কি বল, ইহাকে ফিরাইয়া লইয়া আত্মার খাঁচাস্বরূপ দেহে দিব ?”

এইরূপে তিনি লোককে উপদেশ দিতে লাগিলেন—আর চারিদিকে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়া গেল যে, ইঁহার শীঘ্র দেহ যাইবে—তাই পূর্ব্বাপেক্ষা আরো দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তোমরা কল্পনা করিতে পার না, ভারতের বড় বড় ধর্ম্মাচার্য্যদের কাছে কিরূপে লোক আসিয়া তাঁহাদের চারিদিকে ভিড় করে এবং জীবদ্দশায়ই তাঁহাদিগকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করে। সহস্র সহস্র ব্যক্তি কেবল তাঁহাদের বস্ত্রাঞ্চল স্পর্শ করিবার জন্য অপেক্ষা করে। অপরের ভিতর এইরূপ আধ্যাত্মিকতার আদর হইতেই লোকের ভিতর আধ্যাত্মিকতা আসিয়া থাকে। মানুষ যাহা চায় ও আদর করে

মানুষ তাহাই পাইয়া থাকে—জাতি সম্বন্ধেও ঐ কথা। যদি ভারতে গিয়া রাজনৈতিক বক্তৃতা দাও,যত বড় বক্তৃতাই হউক না কেন, তুমি শ্রোতা পাইবে না কিন্তু ধর্ম্মশিক্ষা দাও দেখি—তবে শুধু বচনে হইবে না, নিজে ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতে হইবে, তাহা হইলে শত শত ব্যক্তি তোমার নিকট কেবল তোমাকে দেখিবার জন্য, তোমার পদধূলি লইবার জন্য আসিবে। যখন লোকে শুনিল যে, এই মহাপুরুষ সম্ভবতঃ শীঘ্রই তাহাদের মধ্য হইতে সরিয়া যাইবেন, তখন তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় আসিতে লাগিল আর মদীয় আচার্য্য-দেব নিজের স্বাস্থ্যের দিকে বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। আমরা তাঁহাকে বারণ করিয়া প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিতাম না। অনেক লোক দূর দূর হইতে আসিত আর তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়া শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, "যতক্ষণ আমার কথা কহিবার শক্তি রহিয়াছে, ততক্ষণ তাহাদিগকে শিক্ষা দিব।" আর তিনি যাহা বলি-তেন, তাহাই করিতেন। একদিন তিনি আমাদিগকে সেই দিন দেহত্যাগ করিবেন, ইঙ্গিতে জানাইলেন এবং বেদের পবিত্রতম মন্ত্র ওঁ উচ্চারণ করিতে করিতে মহাসমাধিস্থ

হইলেন। এইরূপে সেই মহাপুরুষ আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন, পরদিন আমরা তাঁহার দেহ দগ্ধ করিলাম।

তাঁহার ভাব ও উপদেশাবলি প্রচার করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি তখন অতি অল্পই ছিল। অন্যান্য শিষ্যগণ ব্যতীত তাঁহার কতকগুলি যুবক শিষ্য ছিল—তাহারা সংসার ত্যাগ করিয়াছিল এবং তাঁহার কার্য্য পরিচালনা করিতে প্রস্তুত ছিল। তাহাদিগকে দাবাইয়া দিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু তাহাদের সম্মুখে তাহারা যে মহান্ জীবনাদর্শ দেখিয়াছিল, তাহার শক্তিতে তাহারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। বর্ষ বর্ষ ধরিয়া এই ধন্য জীবনের সংস্পর্শে আসাতে তাঁহার হৃদয়ের প্রবল উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতরও সঞ্চারিত হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহারা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। এই যুবকগণ সন্ন্যাসাশ্রমের নিয়ম সমস্ত প্রতিপালন করিতে লাগিল, আর যদিও ইহাদের মধ্যে অনেকেই সদ্‌বংশজাত, তথাপি তাহারা যে সহরে জন্মিয়াছিল, তাহার রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম তাহাদিগকে প্রবল বাধা সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা দৃঢ়ব্রত হইয়া রহিল আর দিনের পর দিন ভারতের সর্ব্বত্র এই মহাপুরুষের উপদেশ প্রচার করিতে লাগিল—অবশেষে সমগ্র দেশ তাঁহার প্রচারিত ভাবসমূহে পূর্ণ হইয়া গেল। বঙ্গ-

মদীয় আচার্য্যদেব।

দেশে সুদূর পল্লীগ্রামে জন্মিয়া এই অশিক্ষিত বালক কেবল নিজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অন্তঃশক্তি বলে সত্য উপলব্ধি করিয়া অপরকে প্রদান করিয়া গেল—আর উহা জীবিত রাখিবার জন্য কেবল কতকগুলি যুবককে রাখিয়া গেল।

আজ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম কোটি কোটি লোকপূর্ণ ভারতের সর্ব্বত্র পরিচিত। শুধু তাহাই নহে, তাঁহার শক্তি ভারতের বাহিরেও বিস্তৃত হইয়াছে আর যদি আমি জগতের কোথাও সত্য সম্বন্ধে, ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা কথাও বলিয়া থাকি, তাহা মদীয় আচার্য্যদেবের—ভুলগুলি কেবল আমার।

এইরূপ ব্যক্তির এক্ষণে প্রয়োজন—এই যুগে এইরূপ লোকের আবশ্যক। হে আমেরিকাবাসী নরনারীগণ, তোমাদের মধ্যে যদি এরূপ পবিত্র, অনাঘ্রাত পুষ্প থাকে, উহা ভগবানের পাদপদ্মে প্রদান করা উচিত। যদি তোমাদের মধ্যে এমন ব্যক্তি থাকেন, যাঁহাদের সংসারে প্রবেশ করিবার ইচ্ছা নাই, যাঁহাদের বেশী বয়স হয় নাই, তাঁহারা ত্যাগ করুন। ধর্ম্মলাভের ইহাই রহস্য—ত্যাগ কর। প্রত্যেক রমণীকে জননী বলিয়া চিন্তা কর, আর কাঞ্চন পরিত্যাগ কর। কি ভয়? যেখানেই থাক না কেন, প্রভু তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। প্রভু নিজ সন্তানগণের ভারগ্রহণ করিয়া থাকেন। সাহস করিয়া ত্যাগ কর দেখি।

এইরূপ প্রবল ত্যাগের প্রয়োজন। তোমরা কি দেখিতেছ না, পাশ্চাত্যদেশে জড়বাদের কি প্রবল স্রোত বহিতেছে? কতদিন আর চক্ষে কাপড় বাঁধিয়া থাকিবে? তোমরা কি দেখিতেছ না, কি কাম ও অপবিত্রতা সমাজের অস্থিমজ্জা শোষণ করিয়া লইতেছে? তোমরা কেবল বচনের দ্বারা অথবা সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা ইহা বন্ধ করিতে পারিবে না—ত্যাগের দ্বারাই এবং এই ক্ষয় ও বিনাশের মধ্যে ধর্ম্মাচলের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকিলেই এই সকল ভাব বন্ধ হইবে। বাক্যব্যয় করিও না, কিন্তু তোমার দেহের প্রত্যেক লোমকূপ হইতে পবিত্রতার শক্তি, ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি, ত্যাগের শক্তি বাহির হউক। যাহারা দিবারাত্র কাঞ্চনের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহাদিগকে ঐ শক্তি গিয়া লাগুক—তাহারা কাঞ্চনত্যাগী তোমাকে এই কাঞ্চনের জন্য বিজাতীয় আগ্রহের মধ্যে দেখিবামাত্র আশ্চর্য্য হউক। আর কামও ত্যাগ কর। এই কামকাঞ্চনত্যাগী হও, নিজেকে যেন বলিস্বরূপ প্রদান কর—আর কে ইহা সাধন করিবে? যাহারা জীর্ণ শীর্ণ বৃদ্ধ—সমাজ যাহাদিগকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহারা নহে, কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে যাহারা সর্ব্বোত্তম ও নবীনতম, বলবান্ সুন্দর যুবাপুরুষেরাই ইহার অধিকারী" তাহাদিগকেই ভগবানের বেদীতে সমর্পণ করিতে

হইবে—আর এই স্বার্থত্যাগের দ্বারা জগৎকে উদ্ধার কর। জীবনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া তাহারা সমগ্র মানবজাতির সেবক হউক—সমগ্র মানবজাতির নিকট ধর্ম্ম প্রচার করুক। ইহাকেই ত ত্যাগ বলে—শুধু বচনে ইহা হয় না। উঠিয়া দাঁড়াও ও লাগিয়া যাও। তোমাদিগকে দেখিবামাত্র সংসারী লোকের মনে—কাঞ্চনাসক্ত ব্যক্তির মনে ভয়ের সঞ্চার হইবে। বচনে কখন কোন কায হয় না—কত কত প্রচার হইয়াছে—কোন ফল হয় নাই। প্রতি মুহূর্ত্তেই অর্থপিপাসায় রাশি রাশি গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু তাহাতে কোন উপকার হয় না, কারণ, উহাদের পশ্চাতে কেবল ভুয়া। ঐ সকল গ্রন্থের ভিতর কোন শক্তি নাই। এস, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কর। যদি কামকাঞ্চন ত্যাগ করিতে পার, তোমার বাক্যব্যয় করিতে হইবে না, তোমার হৃৎপদ্ম প্রস্ফুটিত হইবে, তোমার ভাব চারিদিকে বিস্তৃত হইবে। যে ব্যক্তি তোমার নিকট আসিবে, তাহারই ভিতর তোমার ধর্ম্মভাব গিয়া লাগিবে।

আধুনিক জগতের সমক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘোষণা এই—"মতামত, সম্প্রদায়, চার্চ্চ বা মন্দিরের অপেক্ষা করিও না। প্রত্যেক মানুষের ভিতরে যে সারবস্তু রহিয়াছে অর্থাৎ ধর্ম্ম, তাহার সহিত তুলনায় উহারা তুচ্ছ; আর যতই এই ভাব

মানুষের মধ্যে বিকাশপ্রাপ্ত হয়, তাহার ততই জগতের কল্যাণ করিবার শক্তি হইয়া থাকে। প্রথমে এই ধর্ম্মধন উপার্জ্জন কর, কাহারও উপর দোষারোপ করিও না, কারণ, সকল মত, সকল পথই ভাল। তোমাদের জীবন দিয়া দেখাও যে, ধর্ম্ম অর্থে কেবল শব্দ বা নাম বা সম্প্রদায় বুঝায় না, কিন্তু উহার অর্থ আধ্যাত্মিক অনুভূতি। যাহারা অনুভব করিয়াছে, তাহারাই ঠিক ঠিক বুঝিতে পারে। কেবল যাহারা নিজেরা ধর্ম্মলাভ করিয়াছে, তাহারাই অপরের ভিতর ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করিতে পারে, তাহারাই মানবজাতির শ্রেষ্ঠ আচার্য্য হইতে পারে। তাহারাই কেবল জগতে জ্ঞানজ্যোতিরূপ শক্তিসঞ্চার করিতে পারে।”

কোন দেশে এইরূপ ব্যক্তির যতই অভ্যুদয় হইবে, ততই সেই দেশ উন্নত হইবে। আর যে দেশে এরূপ লোক একেবারে নাই, সে দেশের পতন অনিবার্য্য, কিছুতেই উহার উদ্ধারের আশা নাই। অতএব মানবজাতির নিকট মদীয় আচার্য্যদেবের উপদেশ এই—“প্রথমে নিজে ধার্ম্মিক হও ও সত্য উপলব্ধি কর।” আর তিনি সকল দেশের দ্রঢ়িষ্ঠ ও বলিষ্ঠ যুবকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “তোমাদের ত্যাগের সময় আসিয়াছে।” তিনি চান, তোমরা তোমাদের ভাই স্বরূপ সমগ্র মানবজাতির কল্যাণের জন্য

মদীয় আচার্য্যদেব।

সর্ব্বস্ব ত্যাগ কর; তিনি চান, মুখে কেবল আমার ভ্রাতৃবর্গকে ভালবাসি না বলিয়া তোমার কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য কাজে লাগিয়া যাও। এখন তিনি যুবকগণকে আহ্বান করিয়া এই কথা বলিতেছেন, "হাত পা ছেড়ে দিয়ে তাল গাছ থেকে লাফিয়ে পড় ও নিজে ত্যাগী হয়ে জগৎকে উদ্ধার কর।"

ত্যাগ ও প্রত্যক্ষানুভূতির সময় আসিয়াছে, তবেই জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে, দেখিতে পাইবে। দেখিবে—বিবাদের কোন প্রয়োজন নাই আর তখনই সমগ্র মানবজাতির সেবা করিতে প্রস্তুত হইতে পারিবে। মদীয় আচার্য্যদেবের জীবনের ইহাই উদ্দেশ্য ছিল, সকল ধর্ম্মের মধ্যে যে মূলে ঐক্য রহিয়াছে, তাহা ঘোষণা করা। অন্যান্য আচার্য্যেরা বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম-প্রচার করিয়াছেন, সেইগুলি তাঁহাদের নিজ নিজ নামে পরিচিত। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর এই মহান্ আচার্য্য নিজের জন্য কোন দাবী করেন নাই। তিনি কোন ধর্ম্মের উপর কোনরূপ আক্রমণ করেন নাই, কারণ, তিনি প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে সেগুলি এক সনাতন ধর্ম্মেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র।

সম্পূর্ণ।